কৃশানু

শ্বর বর্মণ । নির্মল চট্টোপাধ্যায়
ামকান্তি ভদ্র । দুলেন্দ্র ভৌমিক
ীর সাহা । রথীন্দ্র ঘোষ
মরেশ মজুমদার । মদন দাশ
লীপ সেনগুপ্ত অসীম চক্রবর্তী
নেশ সিংহ

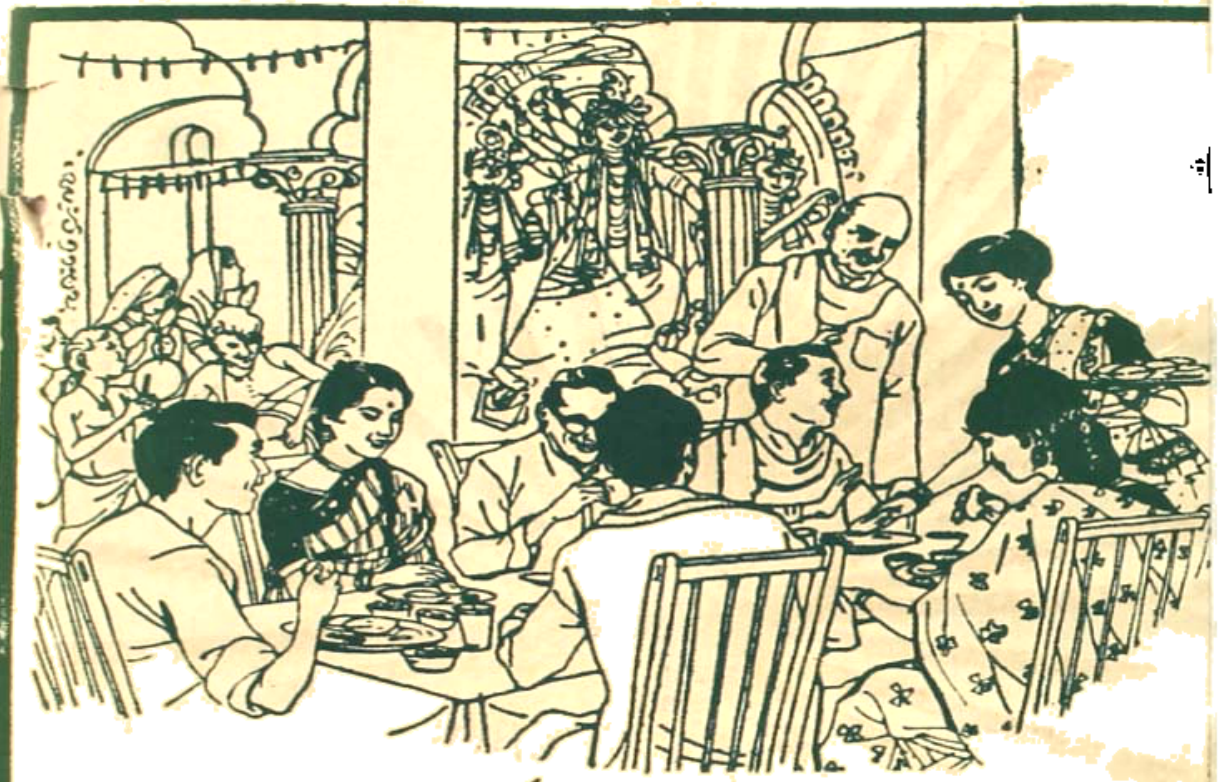

পূজার দিনে
ও উৎসব
অনুষ্ঠানে

লক্ষ্মী ঘি

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (চারতলা),
কলিকাতা-১

সবুজ বিপ্লবে অংশ নিন

কম খরচে বেশী উৎপাদন করুন। একটি ফসল কেটে পরের ফসল বোনার মধ্যে অল্প সময়ে জমি তৈরীর জন্য ট্রাকটর, পাওয়ার টিলার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।

ধান চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী জেটর—২০১১ রাইস স্পেশাল ট্রাকটর এবং কুবোটা ও মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার এখনই পাওয়া যাচ্ছে।

ট্রাকটরে প্রতি ঘণ্টায় তেলের খরচ মাত্র ২·২৫ থেকে ৩ লিটার এবং প্রতি ঘণ্টায় অনায়াসে ২-৩ বিঘা জমি চাষ করা যাবে। পাওয়ার টিলারে তেলের খরচ প্রতি ঘণ্টায় মাত্র ১-২৫ থেকে ১·৫০ লিটার। প্রতি ঘণ্টায় অনায়াসে ৬ ১ বিঘা জমি চাষ করা যায়।

দাম এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

চাষের সেবায়

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (চারতলা)
কলিকাতা-১

গ্রাম—এগ্রিনপুট ফোন নং—২২-২৩১৪

With Best Compliments :

KAUSI PLASTICS

4D, DHARMATALA ROAD,
CALCUTTA

With Compliments of

Eastern Traders

45A, BANCHARAM AKRUR LANE

CALCUTTA-12

Post Box No—7819

অবাধ খুশির আবরণে ছোটোদের বাড়ন্ত পা

বড়োদের চাইতে ছোটোদেরই অনেক তাড়াতাড়ি ঠিক ফিটিংসটা খেয়ে নিতে পারে। তাই ওদের বাটার জুতো এত পছন্দ। অনেকদিন সাথ দেয়। কেননা, বাটার জুতো চাঁড় পায়ে যেমন তাড়াতে ভাঙিয়ে ওঠে, তেমনি বাড়ন্তেও অসুবিধা দেয়। চট, ফিতেহীন, সরল আরাম, জলনুড়ি—সবদিকে চোখ রেখে বাটার জুতো তৈরি। ছোটোদের একজোড়া জুতো কেনে দিতে দিন। দেখবেন ফিটিং খেয়ে নেবে।

বাজ ৮৭
১০.০০

বুটি ৩১
১০.০০

ফরেস্ট ১৮
৪.২০

রোমানিস ১৩
৬.৫০-৮.৫০

ফরেস্ট ৫২
৬.২০-৮.২০

ফুলদুল ১৭
৮.১৫

Bata

Phones : SNT : 44 & 118

To Achieve Success in
"GREEN REVOLUTION"

Use

More Fertilisers.

Nandy Dey Pvt. Ltd.,
P.O. Sainthia, Dt. Birbhum.
Head Office :—
67/49, Strand Road, Calcutta-7
Gram : 'GLOTOBIS' Phones 33-9711 (4 lines)

Space donated by

Balmukunda Agarwala

Grain and Pulses crusher, Merchant and order suppliers.

12D, RABINDRA SARANI,
CALCUTTA-1

FOR ALL KINDS OF IRON & STEEL MATERIALS

Associated Enterprisers (Regd.)

12, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-1

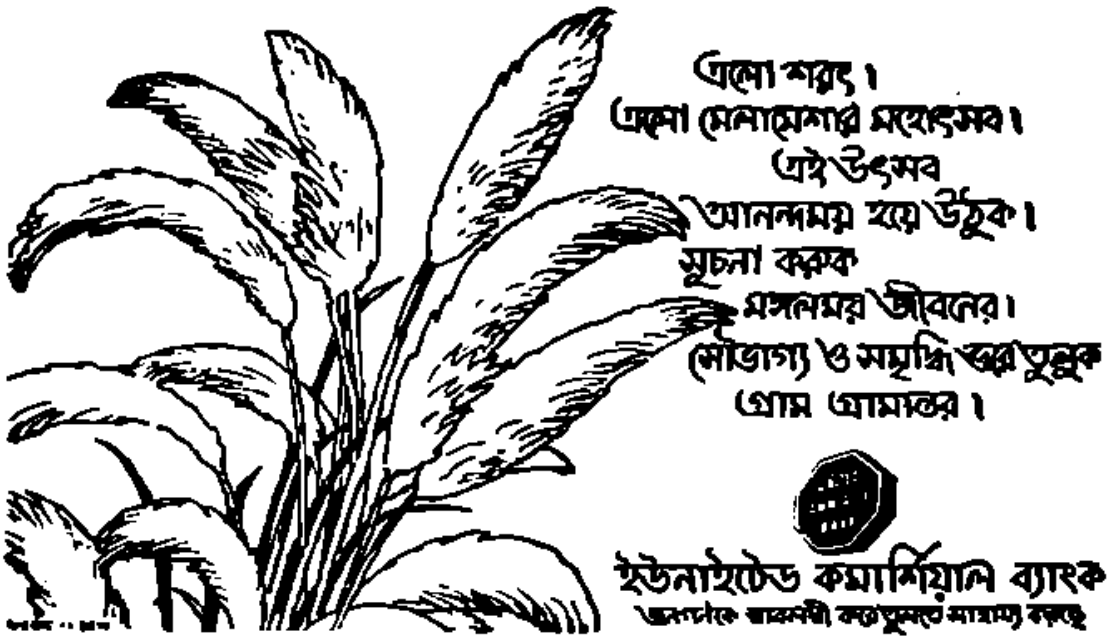

With Best Compliments of

BIRLA JUTE MANUFACTURING CO. LTD.

9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700001

Producers of :

High quality Jute Carpets Hessian, Sacking, Carpet Backing, Synthetic Staple Fibre Yarn, Carbide and other products.

With the Best Compliments of :

ORIENTAL CARRIERS (P.) Ltd.

Regd. Office 1561 CHURCH ROAD
KASHMERE GATE DELHI.

South Eastern Railway Mobile Booking and
SCD Service Contractor.

4, ROYD LANE
CALCUTTA-16

Gram ; 'CONTUBES' {23-5509 / 23-2874

With Best Compliments of

R. N. DATTA & CO.

Manufacturers, Engineers & Contractors.
Makers of Galvd. & Black Quality Conduits,
M. S. Pipes & Accessories.

HOLDERS OF I.S.I. MARK.
MERCANTILE BUILDINGS, Block 'D', 1st floor,
10/1F, Lall Bazar Street,
Calcutta-70000I

Phone : 44-4955
44-4963
44-6917

With Best Compliments of

HINDUSTHAN GAS & INDUSTRIES Ltd.

INDUSTRY HOUSE
10, CAMAC STREET
CALCUTTA-700-017

Factories :

P.O. Parbangla
Via. Batanagar,
Dist. 24 Parganas.
West Bengal : Phone : 79-46 (3 Lines)

22, New Tangra Road.
Calcutta-700-046
Phone : 24-7636 (3 Lines)

। নাটক ।	। নাটক ।	। নাটক ।
লাভার্স লেন	জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়	৩·২৫
চাকভাঙা মধু	মনোজ মিত্র	৩·৫০
নেফা রহস্যময়ী নেফা	বাসুদেব বসু	৪·০০
বাঘা যতীন	বীরু মুখোপাধ্যায়	৪·০০
মৃতদেহ	সমর মুখোপাধ্যায়	৩·২৫
নক্ষত্রের জন্ম	অগ্নিদূত	৩·০০
আজকের একাঙ্ক	(৮টি একাঙ্ক সঙ্কলন)	৫·০০
নতুন রীতির একাঙ্ক	(৬টি নতুন রীতির একাঙ্ক সঙ্কলন)	৬·০০

৩০।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

বাজারের সেরা বলতে···এখন

শ্রীমদনগুপ্তের ফুল পঞ্জিকা

নির্ভুল গণনা : সুন্দর ছাপা : পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত :
প্রতিমাসের গোড়ায় ধর্মকৃত্য : মাসফল ও লগ্নফল :

প্রতি তারিখের দৈনিক রাশিফল

— তথা দামে সুলভ —

শ্রীমদনগুপ্তের হাফ পঞ্জিকা—ও পাবেন

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী

১৩২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১

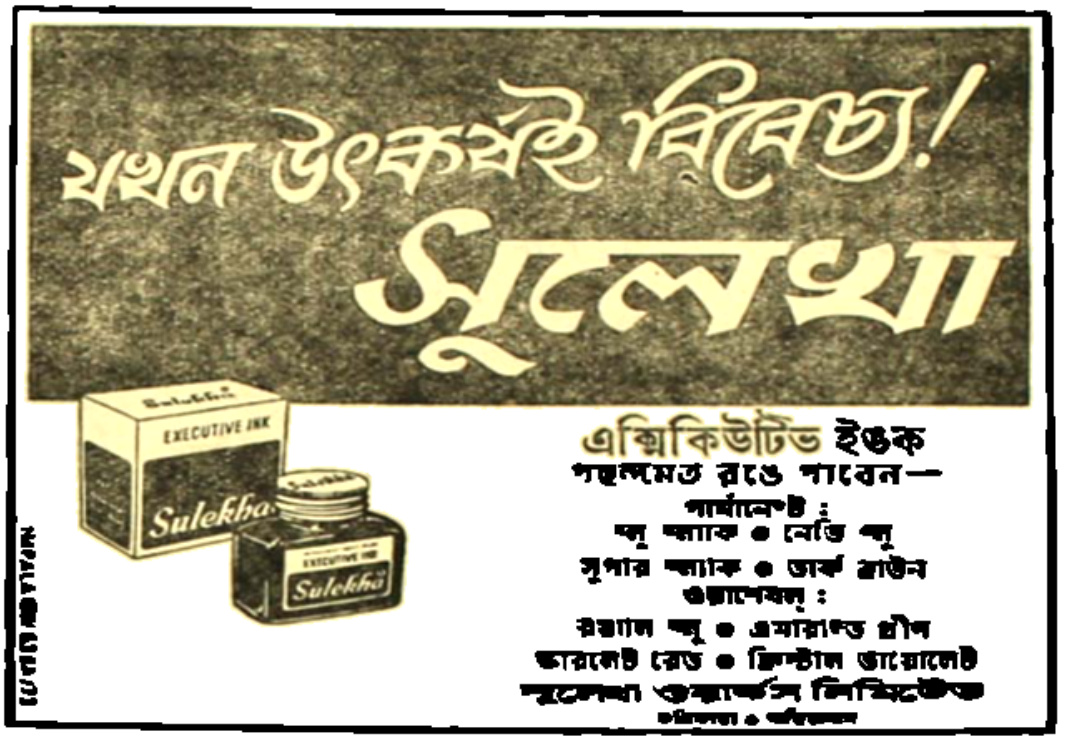

With Best Compliments from

DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES,

NEW CENTRAL JUTE MILLS CO. LTD.,

11, Clive Row,
Calcutta-1

Telephones : 22-4381 (13 Lines)
Telegrams : Sahujain, Calcutta

: *Works* :

ALBION JUTE MILLS.
LOTHIAN JUTE MILLS,
FOUNDRY DIVISION,
NEW CENTRAL JUTE MILLS CO. LTD .
Budge Budge.

Telephones Budge Budge 240 (5 Lines).
Telegrams Newcentral, Budge Budge.

With Best Compliments from

THE ECONOMIC BUILDERS Pvt. Ltd.

ENGINEERS AND GOVERNMENT
CONTRACTORS

BATANAGAR, 24 PARGANAS

Ask For Quality :

Mechanical Engineering Co.

31P, BHATTACHARJEE ROAD
CALCUTTA-58

Phone : 34-3819

মা ও শিশুকে সুস্থ, সবল করে গড়ে তুলুন

- ডিপথিরিয়া, হুপিংকাফ্ ও ধনুষ্টঙ্কার-রোগের প্রতিষেধক হিসাবে শিশুদের ট্রিপল এন্টিজেন দিয়ে নিন।
- মা গর্ভস্থ সন্তানের ধনুষ্টঙ্কার রোগ প্রতিরোধের জন্য টিটেনাস টক্সায়েড দিন।
- মায়েদের রক্তশূন্যতা প্রতিরোধের জন্য ফলিপার ট্যাবলেট খেতে দিন।
- অন্ধ ও রাতকানা শিশুদের ভিটামিন 'এ' অয়েল প্রতিষেধক হিসাবে খাওয়ান।
- যে কোন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে যোগাযোগ করে এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জেনে নিন।

Advt. No. 174/73-74 (পঃ রাঃ পঃ পঃ সংস্থা)

With Best Compliments From :

USHA TELEHOIST LTD.

14, PRINCEP STREET

CALCUTTA-13

With Best Compliments From :

WESTERN COMMERCIAL CORPORATION

CALCUTTA—1

Phone : 23-8609

With Best Compliments From

M/S. Ganesh/Saravana Travels

1, MANGOE LANE. 1ST FLOOR
CALCUTTA-1

REGD. OFFICE
24-B, JATINDAS ROAD,
CALCUTTA-29

BRANCH OFFICE :
BENACHETTY,
DURGAPUR-13

With Best Compliments

M/S Bhagawandas Rameswar

52, Netaji Subhas Road,
Howrah

রুক্ষশাস্থ

মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা ॥ শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮০

সূচী

নির্মল চট্টোপাধ্যায় ।	১	॥	শূন্য
রুদ্রের বর্মল ।	৯	॥	বন্দি-দশা
দিলীপ সেনগুপ্ত ।	২৪	॥	অপহরণ
মদন ঘাস ।	৩০	॥	পার্শ্বচরিত্রের নায়ক
সমরেশ মজুমদার ।	৪৩	॥	নিজের মুখ
প্রভাসকান্তি গুপ্ত ।	৫৬	॥	সূর্যের মুখ চেয়ে
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ।	৭৩	॥	ওদের বাঁচতে দিন
দুলেন্দ্র ভৌমিক ।	৮৩	॥	একদিনের গল্প
দীনেশচন্দ্র সিংহ ।	৯৪	॥	বেওয়ারিশ লাশ
প্রবীর সাহা ।	১০৭	॥	চেনা মুখ
অসীম চক্রবর্তী ।	১১৪	॥	প্রয়োজনের ঘর

P29377

সম্পাদক

দীনেশচন্দ্র সিংহ

অলঙ্করণ

মনাভদ্র

দাম

এক টাকা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

একালের গল্প

দাম—চার টাকা

লিখেছেন

রত্নেশ্বর বর্মণ ॥ মদন দাশ

প্রভাসকান্তি ভদ্র ॥ প্রবীর সাহা

কালীকুমার চক্রবর্তী ॥ অরুণ ইন্দু

কার্তিক মোদক

প্রমুখ

জ্যোতি প্রকাশন, ২।এ, নবীন চন্দ্র লেন। কলি-৯

45-2719
45-5290

With the best compliments from :

M/S. UNION PACKAGING INDUSTRIES

(Manufacturer of Cardboard boxes and Cartoons)

5, BUROSHIBTOLLA MAIN ROAD.
CALCUTTA.38

বর্তমান শারদীয় সংখ্যা থেকে কৃশানু'র ষষ্ঠ-বর্ষ সুরু। ছোট সাহিত্য পত্রিকার দারুণ দুর্দিনে এটা অসামান্য না হলেও অনুপেক্ষণীয় সাফল্য বই কি! কিঞ্চিৎন্যূন এক দশক পূর্বাবধি নূতন সাহিত্য পত্রিকা তথা শারদীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বান ডাকতো যেন। এই সাহিত্য মত্ততায় অনেকেই বিরক্ত হলেও, খাঁটি সাহিত্য-সেবীরা কিন্তু একে স্বাগত জানাতেন। কারণ, শারদ সাহিত্যের বেনাবনে কখনোসখনো নবসৃষ্টির মনিমুক্তার সন্ধান পাওয়া যেতো। পূজায় মজা লুটবার রকমারি ফন্দিফিকিরে যখন সবাই ব্যস্ত, ছাত্র ও যুব সমাজের একাংশ তখন অনন্যমনা হয়ে লেখার জন্যে সাহিত্যিক-দাদাদের পেছনে ছুটে বেড়াত; আর বিজ্ঞাপনদাতাদের অবহেলা উষ্মা ও তিক্ত মেজাজ সহ্য করত। ছোট পত্রপত্রিকাতেই ঘটতো বাণীকুঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা ও নতুন প্রবেশার্থীদের যুগ্ম মিলন।

অধুনা তেহি নো দিবসা গতা। দেশে বোমার দড়ি পাকানো ও মসলা পেষার যুগ সুরু হতেই ছাত্র ও যুবকশ্রেণী পত্রিকা প্রকাশের মতো মোষ তাড়ানো কাজ থেকে প্রায় ছুটি নিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে শূন্যতার স্থান নেই। পত্রপত্রিকা স্টলে সাহিত্য পত্রিকার শূন্যস্থান দখল করে নিয়েছে পিন আঁটা আগাছা ও জঞ্জাল সমষ্টি। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবনতির ফলে মুদ্রণ-শিল্পক্ষেত্রেও আয়ত্তাতীত মূল্যবৃদ্ধির চাপে ছোট-পত্রিকা পরিচালকদের কানে মৃত্যুর পদধ্বনি অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে। অবশ্য যেসব পত্রপত্রিকায় খ্যাতনামা ফিল্মস্টার বিজ্ঞাপন-বাজারের হোমড়া চোমড়া বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণ অর্থানুকূল্যে পুতুল সম্পাদক হয়ে আছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের পক্ষপুটাশ্রিত সাহিত্য সংস্কৃতি শাখার মুখপত্ররূপে যেসব সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত অথচ বিজ্ঞাপনবিহীন পত্রপত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তাদের রসদ সংগ্রহের রহস্যও আমাদের অজ্ঞাত। এই দুইশ্রেণী বহির্ভূত সাহিত্য পত্রপত্রিকাগুলির দিন দিন ক্রমক্ষীয়মান চেহারা তাদের অন্তিম লগ্নের সন্নিকটবর্তীতারই ইঙ্গিত। আমরাও অক্সিজেন দেওয়া রোগীর মতো প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছি। তবু ষষ্ঠ বর্ষারম্ভের উদ্বেগাকুল শুভদিনে পাঠক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানিয়ে, অখ্যাত অজ্ঞাত লেখকদের রচনা কৃশানু'র পৃষ্ঠায় প্রকাশের মূলনীতি ও আদর্শ অনুসরণের অবিচল দৃঢ়তা উচ্চকণ্ঠে পুনরায় ঘোষণা করছি।

মদন দাশ
প্রভাসকান্তি ভদ্র
রত্নেশ্বর বর্মণ
এই তিন তরুণ গল্পকারের নিশ্চিন্ত পরিচিতি এনে দেবে
তিন তরুণের গল্প
দাম : সাড়ে তিন টাকা

দশজন তরুণ গল্পকারের দশটি গল্প
গল্প দশক
দাম : তিন টাকা
"দশকের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে এঁরা কোন স্বেচ্ছাচারিতা ও উন্মার্গগামিতাকে স্লোগান হিসেবে তুলে ধরেননি। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই গল্প লিখতে চেয়েছেন বেশ অন্যভাবে, নিজেদের মতন করে; দৃষ্টিভঙ্গিতেও এঁরা আধুনিক, কম-বেশী বক্তব্য রয়েছে। সব মিলিয়ে সংকলনটিতে বেশ তাজা স্বাদ।"—দেশ
"এ গ্রন্থের গল্পকাররা কিছু কিছু পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প লিখেছেন—বুদ্ধিজীবী পাঠক তা থেকে অভিনবত্বের আস্বাদ পাবেন। গল্পগুলি স্বভাবে ছোট গল্পের মর্যাদাসম্পন্ন, অকারণ কাহিনীবর্জিত নীরস প্রতীকী তত্ত্বকথা বা চালাকি যে নয় তার প্রমাণ আছে।"—অমৃত

সমকালীন সমস্যা অবক্ষয় এবং অসুস্থ মানসিকতার
চূড়ান্ত বাস্তব চিত্রসমষ্টি
সময়ের কণ্ঠস্বর
প্রতিটি পাঠককে নিশ্চিন্ত ভাবিয়ে তুলবে
আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায়
দাম : সাড়ে তিন টাকা

লিপিকা ৩০।১এ, কলেজ রো। কলিকাতা-৯

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

শূন্য

সামনের দেয়ালে বুড়ো ঘড়িটায় প্রথমে বুকে কফ আটকানর মত ঘড়ঘড়ানি শব্দ হল খানিক, তারপর টং টং টং—অনেকগুলো ধাতব ধ্বনি পরপর ঘরের আবদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সামান্য চমকে সন্দীপ ঘড়িটার দিকে তাকাল। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বেলা দশটা। সে সেই সকাল সাড়ে সাতটা থেকে তার অপেক্ষা করছে এই কাঠের আরামবিহীন চেয়ারে বসে। অথচ এখনও চাকর দত্তর নীচে নামার সময় হল না। অসীম বিরক্তিতে সন্দীপের আঁটোসাটো জামার নীচে পেশীবহুল শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, বুকের মধ্যে কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়ল ক্রোধের উষ্ণ বাষ্প। তারই ভাপ খানিকটা বাইরে বেরিয়ে আসায় চোখ মুখ কুঁচকে গেল সন্দীপের।

এই সময় একজন বেয়ারা ঝাড়ন কাঁধে ঘরে এসে ঢুকল, এবং কোনো কথা না বলে ঝাড়ন দিয়ে পটাপট আসবাব পত্র থেকে ধুলো ঝাড়তে সুরু করল। ভাব ভঙ্গীতে মনে হচ্ছিল ঘরের মধ্যে সন্দীপের অস্তিত্বটাই মালুম নেই তার, এবং সময় মত নিরস্ত না করলে হয়ত সে সন্দীপকেও ধুলোর সঙ্গেই ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে ফেলবে। ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ওকে দেখল একটু সন্দীপ, তারপর চাপা অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করল,—"তোমার বাবুর কি নীচে নামার সময় হয়েছে? না ঘুম থেকেই ওঠেনি এখনও?—"

বেয়ারা অপাঙ্গে দেখল সন্দীপকে। বড় লোকের চাকর বাকরও যথেষ্ট বিজ্ঞ অভিজ্ঞ হয়। ভাল মতই জানে তারা বাবু যাকে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত বসিয়ে রাখে অবহেলা ভরে তাকে বিশেষ সমীহ না করলেও চলে। নিরাসক্ত কণ্ঠে বেয়ারা জবাব দিল,—"সময় হলেই নামবে বাবু। আপনি এখন বসুন—" ঝাড়ন কাঁধে সে চলে গেল পাশের দু নম্বর বৈঠকখানায়।

পাশের বৈঠকখানা ঘরটা নতুন হয়েছে। এ ঘরের মত পুরোনো আমলের

কেঠো চেয়ার বেঞ্চি পাতা নয়। বেশ সাজানো গোছানো, সোফা সেট কৌচ শোভিত। ফুলদানিতে রোজ ফুল পাল্টানো হয়। দেয়ালে কয়েকজন পরলোকগত দেশনেতার বাঁধান বড় ফটো। গণ্যমান্য লোকজন এলে বসান হয় ঐ ঘরে, আর সন্দীপের মত অভাজনদের জন্য এই ঘর—নিরানন্দ নিরালোক। কাঠের শক্ত চেয়ারে ছারপোকার ডিপো।

অথচ এক সময় সন্দীপও বিশিষ্ট জন হিসেবে ঐ নতুন বৈঠকখানা ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। মাত্র মাস কয়েক আগেও। তখনও চারু দত্ত এম, এল, এ হয়নি, সবে ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে এই এলাকার প্রতিনিধি হিসেবে। সন্দীপ আর তার ক্লাবের সাঙ্গোপাঙ্গোরা ছিল তখন চারু দত্তর নির্বাচনী ঘরিয়া পেরনর নৌকোয় মাঝি মাল্লার দল। সন্দীপের খুব খাতির ছিল তখন। চারু দত্তর কথাবার্তায় ছিল যথেষ্ট বিনয় আর সম্ভ্রম। ঐ নতুন বৈঠকখানা ঘরে বসেই তখন তারা দিনরাত ইলেকশনের কাজ কর্ম করেছে, ভোটার লিষ্ট চেক করেছে, ভোটারস স্লিপ তৈরী করেছে হাজারে হাজারে। চারু দত্ত পয়সা খরচ করেছে অকাতরে, সেই মওকায় দু চার পয়সা কামিয়ে নিয়েছে অনেকেই, তবু চারু দত্ত যেন সদাই জোড় হস্ত—"এই বাড়ি ঘর সব তোমাদের নিজেদের বলেই ভাববে। যদি জিততে পারি জানবে তোমাদের কথা আমি চিরদিন মনে রাখব।"

তা জিতেছিল চারু দত্ত। আর জিতেই যেন রাতারাতি হয়ে গেল ভিন্ন মানুষ। কোথায় গেল সেই বিনয় সংকোচ আর বশংবদ ভাব। রাস্তায় দেখা হলে চিনতেই পারে না, খুব ভোরে এসে বাইরে বেরুনর মুখে বাড়িতে ধরতে পারলে শুধু হাঁ হাঁ জবাব দেয় আর হন্ হন্ করে হেঁটে গিয়ে উঠে বসে গাড়িতে, আর ড্রাইভার যেন পূর্ব নির্দেশ মতই হাঁকিয়ে দেয় গাড়ি অনাবশ্যক জোরে। ক্লাবের অন্য ছেলেরা কেউ খুব অবাক হল না চারু দত্তর এই ঝটিতি পরিবর্তনে, কেননা এই রকমটাই দস্তুর। তারা ইলেকশনের কাজ কর্ম চলাকালে নগদ বিদায় যা পেয়েছে তাতেই খুশী, পরের ইলেকশনে আবার ছুয়ে নেবে যত দূর সম্ভব, এর মধ্যে চারু দত্তর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই তাদের। ব্যাপারটা সন্দীপও কিছু কিছু জানে এবং বোঝে, কিন্তু তার মনের সঙ্গোপনে আলাদা একটা আশা তৈরী হয়েছিল চারু দত্তকে ঘিরে চারু দত্ত জিতে গেলে মনে হয়েছিল হয়ত সে শেষ পর্যন্ত একটা হিল্লে করে দিতে পারবে।

প্রথম প্রথম চারু দত্ত ওকে যেন সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। বস্তুতঃ

সন্দীপের ঐ নিয়মিত ব্যায়াম করা পেশল শরীরটাকে সকলেই কিছু ভয় পায়। নির্বাচন পরবর্তীকালে চারু দত্তর আচরণে ব্যবহারে যে ভদ্রতা ভব্যতা তা অনেকটাই সেই ভীতি ও ত্রাস থেকে জাত। কেউই বিশেষ ঘাঁটাতে চায়না সন্দীপকে। তার বুকটা কপাটের মত চওড়া, দুটো হাত যেন দুটো পিস্টন, মুখের কাঠামো রুক্ষ লালিত্যহীন, সামনের চুলগুলো বড় হয়ে ঠিক ঝুঁটির মত উঁচু হয়ে আছে। সব মিলিয়ে ওকে দেখলেই বুকের মধ্যে কেমন শির শিরানি জাগে। মনে হয়, সে বড়ই উদ্ধত আর দুর্বিনীত, দুম করে যা তা একটা কিছু করে ফেলা ওর পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

কিন্তু ক্রমেই চারু দত্তর আচরণ ঠাণ্ডা আর নিষ্প্রাণ হয়ে এসেছে। প্রত্যেক রবিবার সন্দীপ এসে বসে থাকে পুরোনো বৈঠকখানা ঘরের কাঠের চেয়ারে, বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অনেক দেরী করে নীচে নামে চারু দত্ত। সন্দীপের প্রশ্নের উত্তরে অনির্দিষ্ট কিছু জবাব দেয়: চেষ্টা চলছে—হয়ে যাবে একটা কিছু শীগগিরই—হলেই খবর পাবে—ক্রমেই সন্দীপ চারু দত্তর প্রতিশ্রুতির অসারতা অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে যাকে সে সবুজ আলোর সংকেত ভেবেছিল, আসলে তা আলেয়ার শঠতা। তবু একেবারে হতাশ হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। সমস্ত বিরূপ ও প্রতিকূল সাক্ষীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মনে হয় দেখাই যাক না আর কটা দিন।

চারু দত্তর কাছে তার এই নিয়মিত আসা যাওয়া নিয়ে সন্দীপের অন্য বন্ধুরা সামনা-সামনি তাকে ঠাট্টা করে, আড়ালে বলে, চারু দত্তর ল্যাংবোট। আজকেই আসার পথে ভোর বেলা দেখা হল রবির সঙ্গে। রবি বলল, —"সন্ধ্যে সময় ক্লাবে যাস সন্দীপ। দুর্গাপুজোর মিটিং হবে।"

সন্দীপ বলেছিল—"নারে। আমার সময় হবে না। কাজ আছে—।"

—"কি কাজ? চারু দত্তর দরবারে হাজিরা দেয়া ত? সে না হয় একদিন নাই দিলি—"

রবির কথার ধরণে হঠাৎ রেগে গিয়েছিল সন্দীপ নিজের মধ্যে। তবু রাগ চেপে সে জবাব দিল,—"হাজিরা নয়। একটা কাজ কর্মের চেষ্টায় আছি।"

—"হুঁ। কাজ কর্ম করে দেবে চারু দত্ত।—" অবজ্ঞা অবহেলায় ভ্রু নাচাল রবি,—"শালা পয়লা নম্বরের ফেরেব্বাজ আর ফোর টুয়েন্টি। তার চেয়ে তুই আজকের মিটিং এ আয়। যদি ঢুকে যেতে পারিস পুজো কমিটিতে

তাহলে টু পাইস—" বুড়ো আঙুল আর তর্জনীসহযোগে পয়সা বাজানর মুদ্রা দেখাল সে।

একটু চুপ করে রইল সন্দীপ। রবির দোষ নেই। এই সব পুজো আর্চা বিচিত্রানুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজনের মাধ্যমে ওদের সকলেরই কিছু রোজগার হয়। দু একটা প্যান্ট সার্ট করান, চুল কাটা দাড়ি কামান সিগারেট খাওয়ার খরচটা উঠে আসে এ ভাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সন্দীপ যেন কোনো উৎসাহ পাচ্ছিল না রবির কথায়। কেমন যেন অহেতুক আর অনর্থক বলে মনে হল সব কিছু। ক্লান্ত উদাসীন ভাবে বলল,—"নারে! আমার আর ভাল লাগে না ও সব! কি হবে—"

অবাক বিস্ময়ে সন্দীপের দিকে তাকাল রবি,—"কিরে শালা! তুই সচ্চরিত্র সাধু বনে গেলি নাকি হঠাৎ!"

সচ্চরিত্র সাধু বনে যাওয়া নয়। আসলে নিজেকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছিল না সন্দীপ। এই অনিশ্চয় অনির্দিষ্টতা আর ভাল লাগে না তার। এর বদলে সে চায় একটা ধরা বাঁধা জীবন। জীবনের একটা সুনির্দিষ্ট ছক নিয়ম শৃঙ্খলা। ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠা দোকান বাজার খবরের কাগজ পাঠ, স্নান খাওয়া সেরে কাজে যাওয়া, তারপরে হয় ত একটা বিয়ে, তার ও পরে—এতদূর পর্যন্ত ভাবতে পারে না সন্দীপ। আপাততঃ তার দারুণ রকমের প্রয়োজন এই উদ্বৃত্তি ও অস্থিরতাকে কাটিয়ে উঠে একটা কঠিন ও স্থির অবলম্বন, যাকে আশ্রয় করে জীবন একটা অর্থ ও তাৎপর্য খুঁজে পেতে পারে।

চারু দত্ত নীচে নামল ঠিক সাড়ে দশটায়।

তার মেজাজ ভাল ছিল না। যে দলের টিকিটে এম. এল, এ হয়েছে তার মধ্যে আছে অনেকগুলো উপদল। সুতরাং আছে উপদলীয় কোন্দল। ইদানীং এই কোন্দল ও কাদা ছোঁড়াছুড়ি বড়ই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে এসেছিল, এবং চারু দত্তর মত অনেককেই বেশ বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। আজ সকালেই খবরের কাগজে এমন কতগুলো খবর পড়ল যার সম্বন্ধে সে বিন্দু-মাত্র ওয়াকিবহাল ছিল না, এবং শেষ মুহূর্তে কোন ডাল ছেড়ে কোন ডাল ধরলে সব চেয়ে ভাল ফসল তোলা যাবে গোলায় তা ঠিক ঠাক বুঝে উঠতে পারছিল

না। ফলে চান্নু দত্তর দুই ভ্রূর মধ্যবর্তী সংকীর্ণ আয়গাটুকুতে ঘন ঘন অনেক-গুলো ভাঁজ আপাততঃ বেশ স্থায়ীভাবেই বিরাজ করছিল।

ভ্রুকুঞ্চিত মুখেই চান্নু দত্ত প্রশ্ন করল,—"কি খবর?"

মেজাজ ভাল ছিল না সন্দীপেরও। একটু আগেই সে মনে মনে স্থির করেছে আজই যা হোক একটা ফয়সলা করে যাবে। রোজ রোজ এই ভাবে এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকলে আত্ম-সম্মান বজায় থাকে না। সমান গম্ভীরভাবে সে বলল,—"খবরত আপনি দেবেন। আমিত খবর নিতেই এসেছি।"

লাঠির মত মোটা চুরুটটায় ঘন ঘন কটা টান দিল চান্নু দত্ত। বেশ একটা সুগন্ধী আমেজ ছড়িয়ে পড়ল পরিমণ্ডলে। ধোঁয়ার কুণ্ডলির মধ্য থেকে চান্নু দত্ত বলল,—"তোমাকে ত বলেছি। সময় হলে ঠিক খবর পেয়ে যাবে। এভাবে রোজ রোজ তোমার আসার দরকার নেই।"

—"আমি ত রোজ রোজ আসি না—"

—"ঐ হল।" অল্প উত্তেজিত ভাবে বলল চান্নু দত্ত,—"মাঝে মাঝেই ত আসছ। শোন সন্দীপ, আমার সময়ের যথেষ্ট দাম আছে। এ ভাবে হট হাট এসে আমার সময় নষ্ট করার কোনো অধিকার নেই তোমার।"

ভ্রু কুঁচকে অপলকপাত দৃষ্টিতে চান্নু দত্তর দিকে তাকিয়ে রইল সন্দীপ। চান্নু দত্ত দেখল সন্দীপের দুই চোখের সাদা জমিতে জলের মত ছড়ান শিরা উপশিরাগুলোতে রক্ত উথলে উঠল,—"আপনার কি ধারণা, আমাদের সময়ের কোনো দাম নেই?"

—"হ্যাঁ!" তাচ্ছিল্য ভরে চান্নু দত্ত বলল,—"তোমাদের আবার সময়ের দাম! হয় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে রাতদিন গুলতানি করছ মেয়েদের পেছনে টিটকারী মারছ, আর নয় ত ক্লাব ঘরে বসে ক্যারাম পিটছ—"

এবারে সত্যই ক্ষেপে গেল সন্দীপ। ফুঁসে উঠল,—"আর আপনি কি করছেন? একটা চাকরী করে দেবেন বলে সমানে ঘোরাচ্ছেন ছ মাস ধরে।"

—"হুম্! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। কত এম-এ পি এইচ ডি পাস দিয়েছে যে মুখ থেকে কথা খসালেই চাকরী হয়ে যাবে! চাকরী কি হাতের যোয়া না গাছের ফল।"

প্রচণ্ড রাগটা সন্দীপের মাথার মধ্যে সমানে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। এ ভাবে খোলাখুলি কথাবার্তা এর আগে কোনো দিন বলেনি চারু দত্ত। তার ইচ্ছে করছিল একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। চেয়ার টেবিল টেনে হিঁচড়ে তছনছ করে দেয়। সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। তবু অসীম ক্ষমতায় নিজেকে সংযত করল সন্দীপ। ক্রুদ্ধ বিস্ফোরক থমথমে গলায় সে বলল,—"তা হলে আপনি বলছেন চাকরী হবে না?"

—"না না। ওসব চাকরী ফাকরী কিছু হবে না আমার দ্বারা। যাও—"

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সন্দীপ। ক্রমেই তার কপালের মোটা শিরাটা নীল হয়ে উঠছে, চোয়ালের হাড় দুটো হয়ে উঠছে কঠিন ও প্রকট,—"তা হলে আমাকে এতদিন ধরে ঘোরালেন কেন"

চারু দত্ত ক্ষেপে গেল,—"তুমি আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছ? এ্যাঁ? কৈফিয়ৎ চাইছ! লাই পেয়ে মাথায় উঠে গেছ। তাই না!—"

শান্ত কণ্ঠে সন্দীপ বলল,—"কৈফিয়ৎ চাইছি না। চাকরী করে দেবেন বলে আপনি আমাকে ছ মাস ধরে ঘোরালেন। আজ বলছেন হবে না। এখন আমি কি করব বলে দিন—"

—"কি করবে তা আমি কি জানি। মোট বও গে যাও। ঠেলা গাড়ি ঠেল। নয়ত জুতো বুরুশ কর। কাজ করার ইচ্ছে থাকলে আবার কাজের অভাব। তা নয় খালি ঘরেরটা খেয়ে বাইরে মাস্তানি ফলিয়ে বেড়াবে। হুঁ!—

আর কোনো কথা বলল না সন্দীপ। চুপচাপ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আঁটো জামার নীচে কপাটের মত বিস্তৃত বুক যেন আরো চওড়া হয়ে উঠেছে। অনেকটা লম্বা সে। চেয়ারে বসে বেঁটে খাটো চারু দত্তর অস্পষ্ট ভাবে মনে হল সামনে দিগন্তে যেন মেঘ জমেছে ঘন। দুটো পা অল্প ফাঁক করে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সন্দীপ। দু হাত প্যাণ্টের দু পকেটে। চাপা রাগে তার কণ্ঠস্বর আচ্ছন্ন অস্পষ্ট হয়ে উঠল,—"কাজটা ভাল করলেন না চারু দা।

কথাটা শোনা মাত্রই যেন চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল চারু দত্ত। হাত পা ছাড়তে লাগল ঘন ঘন,—হ্যাঁ! তুমি আমাকে থ্রেটেন করছ। হ্যাঁ! এতদূর

আস্পর্ধা তোমার। একজন এম এল এ কে থ্রেটেন করার ফল কি হতে পারে তুমি জান? ইচ্ছে করলে আমি তোমাকে ছ মাস জেলে হাওয়া খাইয়ে নিয়ে আসতে পারি। সে ক্ষমতা আমার আছে তুমি জান তা—"

ততক্ষণে সন্দীপ বাড়ির বাইরে রাস্তায় চলে এসেছে।

রাস্তা দিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে অথচ খুব দ্রুত হাঁটছিল সন্দীপ। দুটো হাত প্যান্টের দু পকেটে, চওড়া কাঁধ দুটো একটু ভাঁজ হয়ে গেছে, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনে। সে কোথায় যাচ্ছে জানে না, রাগ ক্ষোভ দুঃখ জ্বালা ও ঘেন্না—নানারকম অনুভূতিতে তার সমগ্র সত্তা আবিল হয়ে উঠেছে, কোনো কিছুই সে ভাবতে পারছে না ঠিকঠাক।

গত ছ মাসে সে জীবন যাত্রার একটা নির্দিষ্ট রকম প্রণালী খুঁজে পেয়েছিল। মনোমত না হলেও একটা নিয়ম ছিল তাতে। একটা উজ্জ্বল সবুজ আলোকে ঘিরে নিয়মিত আবর্তন। আলোটার নাম আশা। প্রতি রবিবারে চারু দত্তর বাড়িতে হাজিরা দেওয়া এবং একটা অনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিকে লাইফ—বেল্টের মত অবলম্বন করে পুরো সপ্তাহের কর্মহীন সমুদ্রটাকে পেরিয়ে যাওয়া।

আজ চারু দত্ত অত্যন্ত নির্মম ভাবে সব কিছু নষ্ট করে দিল। এখন আর কিছুই রইল না সামনে। এখন দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ জুড়ে সামনে কেবল নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতা—। চারু দত্ত যদি তাকে কোনো একটা কাজ জুটিয়ে দিতে নাও পারে, তার উচিত হয়নি সন্দীপের নিজের তৈরী সেই জীবনযাপনের ছকটাকে এভাবে এলোমেলো করে দেওয়া—

হয়ত সন্দীপ শেষ পর্য্যন্ত চারু দত্তর কথামত মোটই বইবে বা ঠেলা গাড়ি ঠেলবে বা বুরুশ করবে জুতো, অথবা হয়ত সে ওয়াগন ভাঙবে, চৌরাস্তার মোড় পেরিয়ে বাঁ হাতি বটগাছের ঝুপরি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে খেলনা পিস্তলের ভগায় কেড়েকুড়ে নেবে মেয়েদের গায়ের গয়না, পুরুষের হাতের ঘড়ি আর পকেটের মানিব্যাগ। যা হোক একটা কিছু ঠিকই করবে সে, কেন না প্রকৃতি তার ধর্ম অনুযায়ী নিজে থেকে ভরিয়ে তোলে সব শূন্যতা। কিন্তু তার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল একটা ধরা বাঁধা কাজের। সন্দীপ কিছু অসাধারণ ছেলে নয়। নৌকো ভাসিয়ে আন্দামানে পাড়ি জমানর সামর্থ্য নেই তার। ক্ষমতা নেই যে

চড়ে বসে হিমালয়ের চূড়োয়। কপর্দক শূন্য অবস্থা থেকে শুরু করে বাণিজ্য লক্ষ্মীকে বন্দিনী করে ফেলে নিজের লোহার সিন্দুকে—এমন চতুরতা ঘোরাবার বুদ্ধিও নেই তার। নিয়মের মধ্যে থেকে নিয়মিত একটা কাজকর্ম পেলেই সে বর্তে যায়।

সে প্রয়োজন যখন মেটার নয়, এখন উদ্ধত উগ্র চেহারার মধ্যে একটি অসহায় ছেলে অত্যন্ত দিশাহীন বিমূঢ় বোধ করছিল। ঐ রুক্ষ চোয়াড়ে মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ওর দুচোখের তারার দিকে তাকালে দেখা যাবে নিদারুণ বিভ্রান্তিতে তা টালমাটাল অস্থির। আপাততঃ এক বিন্দু সহানুভূতির বড় প্রয়োজন ছিল সন্দীপের।

কিন্তু তাও বুঝি পাওয়া সম্ভব নয়।

বন্দি-দশা

পথের পাঁচালির অপুর বাল্যকালে ইচ্ছে হয়েছিল, বড় হলে সে তামাকের দোকান করবে। বস্তুত ছেলেবেলায় অনেকেরই এমনি আজব কল্পনা হয় ভবিষ্যৎ জীবন অথবা জীবিকা সম্পর্কে। অসীমের নিজেকেও কৈশোর বয়সে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কোন স্কুল-পরীক্ষায় রচনার প্রশ্ন হয়েছিল—'তোমার ভবিষ্যৎ জীবন'। বিষয়টাকে এর আগে কখনো ভেবে দেখেনি অসীম। সুতরাং থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। সহপাঠীদের বাকি সকলেই অবলীলা ক্রমে লিখে দিয়েছিল—কেউ ডাক্তার হবে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে। অসীম লিখেছিল ভবিষ্যৎ জীবনে সে শিক্ষক হতে চায়। কারণ তখনই তার মাথায় এমনি একটা ধারণা উঁকিঝুঁকি মারছিল যে অর্থটাই পরমার্থ নয়, এর চেয়েও আছে মহত্তর কিছু। ক্লাস-শিক্ষক খাতা ফেরত দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—অসীম মুখার্জি কে? অসীম উঠে দাঁড়াতেই এক-ক্লাস ছেলে এবং শিক্ষক মশাই এর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল অসীমের উপরে। মাস্টার মশাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, ইশারায় বসতে বললেন। অসীম ওই বয়সে স্থির করেছিল, বড়ো হলে সে স্কুলের হেডমাস্টার হবে। অবশ্য পরবর্তীকালে কলেজ জীবনে, সে তার ভবিষ্যতের মডেল বদল করে ফেলেছিল। ক্রমশঃ ও অধ্যাপক পি. জি'র ফ্যান হয়ে পড়েছিল। পি. জি ছাত্রদের কলেজ-পাঠ্যসূচীর বাইরের কিছু কিছু জিনিসও বোঝাতেন, যাতে অসীমের আকর্ষণ ছিল অধিক পরিমাণে। পি. জি. মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে যেতেন, তখন তাঁর মুখে অসীম যেন জ্যোতি গোছের কিছু একটার বিচ্ছুরণ দেখতে পেত। তিনি একটা বড় বাড়ীর চিলে কুঠরীতে থাকতেন। নিজে-হাতে রান্না করতেন এবং সুভাষ মুখুজ্যের কবিতার বই দিয়ে ডালের কড়া ঢাকা দিতেন। অসীম মনে মনে স্থির করেছিল সে এম. এ. পাশ করে কলেজে অধ্যাপনা করবে। অবশ্য মাঝে মধ্যে মন্ত্রী অথবা সরকারী

আমলা অথবা অন্য রকম শাঁসালো কিছু হবার সাধ যে মনে না জেগেছে এমন নয়। কিন্তু নিজে নিজেই সে ধারণা বাতিল করে দিয়েছে।

এম. এ পাশ করার বেশ আগেই সব জল্পনা কল্পনা ওলট-পালট হয়ে গেল। কারণ বাস্তবের উত্তাপটা লেগেছিল সরাসরি এবং বুঝতে পেরেছিল যে, তার পরিকল্পিত ছকের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎটা চলবে এমন কোন গ্যারান্টী নেই। বস্তুত: সে চাকরির খাতা শুরু করেছিল বি. এ পাশ করার আগে থেকেই, একটা সরকারি অফিসে নিম্ন-বর্গীয় কর্মিকের চাকরির জন্য পরীক্ষার মাধ্যমে। চাকরির নির্বাচনী-পরীক্ষা দিতে গিয়ে অসীম দেখল, চারটি শূন্যপদের জন্য দু'হাজার ছেলে পরীক্ষা দিতে এসেছে। অসীমও পরীক্ষা দিল এবং ভাবল যে কোন রকমের কাকতালীয় যোগাযোগে চাকরিটা ওর হয়েও যেতে পারে। হলেও বেশিদিন সে এ চাকরি করবে না। অবশ্য চাকরিও হলো না। এমনি করে টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়ে অসীম এম. এ পাশ করে গেলো। তখন সে যেন তীব্রণ-প্রাজ্ঞ ও প্রবীন হয়েছে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে।

অসীমের দৈনন্দিন জীবনে তিনটে কাজ জুটল, ইংরেজী খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়া, দরখাস্ত পাঠান এবং ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া। অসীম কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি পড়ে এটা আবিষ্কার করল যে, আমাদের এই ভারতবর্ষে অসীমের অনেক চাকরি পাবারই যোগ্যতা আছে। অথচ চাকরি পেল না। অধ্যাপক, হেডমাস্টার হওয়া দূরস্থান এমনকি একটা সামান্য স্কুল টিচারের চাকরি জোটানও অলীক মনে হল। অবশ্য ইন্টারভিউ দেওয়া বন্ধ করল না, লটারীর টিকিট কাটার মত এটা একটা হবি হয়ে দাঁড়াল। লোক যেমন লটারীর টিকিট কাটে অথচ জানে পুরস্কারটা কোনদিন তার আসবে না। তেমনি অসীমও স্থির করে ফেলেছিল চাকরি তার হবে না। অবশ্য অসীম প্রথম দিকটায় ইন্টারভিউতে খুব যত্ন নিত; ভালো পোষাক পরে যেত, ঘর থেকে বেরোবার আগে কেউ যেন না দেখে এমনি আড়ালে মা কালীর ছবি প্রণাম করত, ইন্টারভিউ-সহায়িকা নানান বই পড়ত। সব মিলিয়ে কেমন যেন পবিত্র পবিত্র হয়ে যেতে চাইত। অত সিরিয়াস হত বলেই হয়ত ইন্টারভিউ খারাপ হয়ে যেত। এখন আর কিসসু ভাবে না; গোঁফ দাড়ি না কামিয়েও ইন্টারভিউ দিতে যায়। যা খুশি তাই জবাব দেয়।

ইন্টারভিউ দেওয়াটাকে অসীমের এখন আন্দোলনের মত, মিছিলের

মত, ঘেরাওএর মত গরগরে একটা কিছু মনে হয়। যেন সমাজকে চিৎকার করে জানান দেওয়া যে আমার চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা আছে অথচ তোমাদের দেবার ক্ষমতা নেই। ব্যাস্, এই পর্যন্ত, আর কিছু নয়। বস্তুত অসীম এটা স্থিরই করে ফেলেছিল, চাকরি ওর কোনদিন হবে না। টিউশনি' করতে করতে ওর চুল পেকে যাবে। ও একদিন অত্যন্ত দৈন্য-দশার মধ্যে মরে যাবে। একথা ভাবলে ওর মন দুঃখে ভরে উঠত।

সেদিন সকালেও সূর্য নিশ্চয়ই সামনের বাড়ীর দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছিল। অবশ্য আজকাল অসীমের আর সকালের সূর্য দেখার সৌভাগ্য হয় না। সূর্য যখন লাফিয়ে আকাশের অনেকটা উপরে উঠে পড়ে তখন মায়ের ডাকে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সে আড়মোড়া ভাঙে এবং হঠাৎ লাফিয়ে বিছানা থেকে কল ঘরে চলে যায়। মুখ ধোয়, চা খায়, খবরের কাগজে চোখ-বোলায়। অন্যদিন যেমন যেমন চলে এ-দিনের সকালটা ও তেমনি তেমনি কাটল; কোন বৈশিষ্ট্য বা নতুনত্ব নেই: সকালটা গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল, ময়লার ড্রামগুলোকে কর্পোরেশনের লোকেরা যেভাবে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলে। দু'বার হাই তুলল, খবরের কাগজে চোখ ফেলল। হেডিং—তাপ প্রবাহে এ পর্যন্ত তিনশো পঞ্চাশ জন বলি। তার পর ক্রিকেটের স্কোরবোর্ডের মত জায়গাওয়ারী হিসেব—কানপুর—৭০, বারাণসী—৩৭, বালিয়া—৪২, মজফ্‌রপুর—২২, বারন্‌পুর—১৭ ইত্যাদি ইত্যাদি। কলকাতায়ও ভীষণ গরম পড়েছে। অসীমের রাতের গভীর ঘুমেও টোল পড়েছে অনেকবার। এসময়ে বিনা ভূমিকায় অত্যন্ত অভাবিত ভাবে চিঠিটা এসে গেল। পোস্টম্যান কড়া নাড়ল, অসীম নিজে দরজা খুলল। পোস্টম্যান বলল, অসীম মুখার্জী-কে আছেন? রেজিস্টার্ড চিঠি আছে। অসীম হাত বাড়াল। লোকটাও যেন একটু আশ্চর্য হল, এমনি অনায়াসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে হাতের কাছে পেয়ে যাবে এতটা যেন সে ভাবেনি। অসীম সই করল, চিঠি নিল। অসীমের নামে রেজিস্টার্ড চিঠি আসা এমন কিছু আশ্চর্য নয়। আজকাল ইন্টারভিউর চিঠিও কখনো সখনো রেজিস্টার্ড ডাকে আসে। একটা উইণ্ডো খামের ফাঁক দিয়ে অসীমের নাম ঠিকানা উঁকি মারছে। ফ্রাঙ্কিং মেশিনে ছাপ দেওয়া ডাক টিকিটের পরিমাণ, এবং খামের একেবারে নিচে কোম্পানীর নাম ছাপা. রয়েছে—উইলিয়াম জোন্স এণ্ড

কোম্পানী ইণ্ডিয়া লিমিটেড্। কোম্পানীর নামটা অসীমের স্মরণে থাকার কথা নয়, কেননা ঐই ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে সুরু করে কলকাতা শহরে এ যাবৎ অসংখ্য কোম্পানী জন্ম নিয়েছে ; এবং অসীমের চার বছরের বেকারী-জীবনের পরিধিতে এমনি অসংখ্য কোম্পানীতে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে। কিন্তু নামটা স্মরণ হল, কেননা গত সপ্তাহেই-সে ইণ্টারভিউ দিয়ে এসেছে। বিলিতি কোম্পানীগুলির সৌজন্যবোধ প্রশংসনীয়, রিগ্রেট লেটার পাঠায় বেশ তাড়াতাড়ি। যদিও যথার্থ বিলিতি কোম্পানী আজ নেই একটিও, রাজদণ্ড এবং বণিকের মানদণ্ড সবকিছু এখন আমাদেরই হাতে। অসীম অত্যন্ত অবহেলা ভরে খামটা খুলল, খুলতে গিয়ে চিঠির এক কোণা খানিকটা ছিঁড়েও গেল। এর ভিতরের ভাষা ওর মুখস্থই আছে। বাংলা তর্জমায় যা দাঁড়ায়—মহাশয়, আপনি আমার কোম্পানীতে দরখাস্ত দিয়া এবং পরবর্তীকালে ইণ্টারভিউতে উপস্থিত হইয়া কোম্পানীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আপনাকে চাকুরীতে মনোনীত করিতে না পারিয়া আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত। অসীম তবু চিঠিটা একবার পড়ল ; আশ্চর্য হল, ওর বুকের মধ্যে দাঁড় পড়ার ছল ছলাৎ আওয়াজ হল। ও চোখ রগড়াল, আবার পড়ল। ইউ আর হিয়ার বাই অ্যাপয়েণ্টেড্। তক্তপোষের তলায় কুঁজো থেকে জল ঢেলে খেল, আবার পড়ল, আবার……। অসীম মুখার্জীর চাকরি হয়ে গেছে। ওর সে বোকা নাপিতের গল্প মনে পড়ে গেল। বোকা নাপিতকে রাজার লোক ধরে নিয়ে গিয়ে রাজকন্যের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজ্যও। ওর নিজেকে বোকা নাপিতের মত মনে হল। না, তা কেন মনে হবে। অসীম নিজেকে চাঙা করতে চাইল। বস্তুত এ চাকরি পাওয়ার জন্য শিক্ষাগত যে যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল তার সবটাই আছে অসীমের। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার ডিগ্রি-হাই সেকেণ্ড ক্লাস, ল পাশ করেছে, কটিং এর এক পার্টও পাশ হয়েছে। আর কী চাই! বুকের পাছায় মাপ চাও শালারা। ইণ্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করেছিল—আচ্ছা, মিস্টার মুখার্জী, আপনার কোন রিলেটিভ মিনিস্টার আছেন ? – নো।—ডি. এম. আছেন, আই. সি. এস আছেন, আই. পি. এস আছেন ?—নো নো, নো। ইণ্টারভিউ নেওয়ার ধলথলে চেহারার লোকটা কৌতুকে মিটিমিটি হেসেছিল—এনি ফিল্ম স্টার ? অসীম রাগত-স্বরে জবাব দিয়েছিল—রাবিশ।

অসীম এখন থেকে মাসে এগার শ' টাকা মাইনে পাবে। এগার শ' টাকায় কি হতে পারে? এগারটা ভালো টেরিলিনের প্যান্ট হতে পারে, পকাশ বোতল হুইস্কি হতে পারে, তিন কুইন্টাল চাল ব্লাকে কেনা যেতে পারে, একটা মেয়েমানুষকে পাকাপাকি বিয়ে করা যেতে পারে, একটা মধ্যবিত্ত পরিবারকে এই মহার্ঘের বাজারেও অক্লেশে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বস্তুত এগার শ' টাকায় দুনিয়াটা কিনে নেওয়া যেতে পারে, পৃথিবীর যাবতীয় সুখ, আমোদ, আহ্লাদ।

এখন চাকরি পাওয়ার সংবাদটা বাড়ীতে চাউর করে দেওয়া প্রয়োজন। এমন একটা সংবাদ জানাতে অসীম কতক্ষণ দেরী করল! ও ছোটবেলার মত চেঁচামেচি করে বলতে পারত মা, দেখগো কি মজা! খবরটা বলতে যেন ইচ্ছে হল না অসীমের। যেন ও খুশী হয়নি চাকরিটা পেয়ে। অথচ খুশী না হওয়ার কোন কারণ নেই। খুশীর গোলাপটার পাশে কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে আছে। অসীম জানেনা বেদনাটা কোথায়। কেয়াকে খবরটা জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, বিকেলেই দেখা হবে। অতটা দেরী করতে ইচ্ছে হলনা অসীমের। ইচ্ছে হল দস্যির মত কেয়াদের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকে পড়ে। এবং বলে—কী চিনতে পারছ? তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলবে—এত অনুনয় করেছি, একটা চুমু দাওনি, জানো এখন আমি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ের লক্ষ চুম্বন কিনে নিতে পারি। ওর একবার আড্ডায় যেতে ইচ্ছে করল। এখন কালী কেবিনে আড্ডাটা খুব জমে উঠেছে। শালারা খুব রাজা উজীর মারছে আর চারমিনার ধ্বংস করছে। খবরটা ছোট বলের মতো দঙ্গলের মাঝখানে ছুঁড়ে দেবে। এগারশো টাকা মাইনে—বিশ্বাস হচ্ছেনা? হবে না, হবে না, হবার নয়। কোন মিনিস্টার আত্মীয় আছে? কোন ডি. এম. এডি এমের কাছে বোন বিয়ে দিয়েছ? নেই কেউ? গুল মারা হচ্ছে, শালা। অবনী কাঁদো কাঁদো গলায় হাত ধরে বলবে—অসীম তুই আমাদের দল ছেড়ে বেরিয়ে গেলি।

অসীমের সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল বাবা বারো টাকা কেজির কাটাপোনা এনেছেন বাজার থেকে। প্রথম মাসের মাইনে পাওয়ার পর অসীম কী করবে তাই ভাবল। মা পরিপাটি করে খাওয়ালেন। অসীম খেল।

ভালো দেখে জামা কাপড় পরল। ওকে অফিসে খুব স্মার্ট হতে হবে। এ কথা ভেবে একটু নার্ভাস হয়ে গেল যেন। অনেকদিন বাদে লজ্জা লজ্জা করেও টুপ করে মাকে প্রণাম করে ফেলল। মা সতর্ক করে দিলেন খুব সাবধানে যাস। উপরওয়ালার সাথে ঠাণ্ডামাথায় কথা বলিস। অসীম মনে মনে ভাবল—খেপেছ এগারশো টাকা মাইনের চাকরীর উপরওয়ালা, তার সাথে চটাচটি করব।

ট্রামের পাদানিতে অনেক কষ্টে পা ছোঁয়াল, অমনি ট্রামটা গড় গড় করে চলতে সুরু করে দিল। এমনি চলাতে অসীমের অভ্যাস আছে, কলকাতা শহরের অন্য অনেকেরও। অসীমের ঝুলে ঝুলে অফিসে যাওয়ারও আজ শেষ দিন। কোম্পানীর নিয়োগ পত্রে নগদ অর্থপ্রাপ্তি ছাড়াও যে সব সুখ সুবিধা দানের অঙ্গীকার আছে তার মধ্যে কোম্পানীর গাড়ীতে অফিসে যাতায়াতের ব্যবস্থাটাও আছে। সুতরাং ঝুলোঝুলি, কনুই-এর গুঁতো, ঘামের গন্ধ ইত্যাদি থেকে মুক্তি। কোন কিছু থেকে মুক্তি পাওয়াই যেন শেষ কথা নয়, এখন ওর বিগত জীবনের জন্য ভীষণ মমতাবোধ হল।

রাগ রাগ রোদ্দুর, ঘরবাড়ী পথ ঘাট ক্রত তেতে উঠেছে রোদের আঁচ অসীমের গায়েও লাগছে পুরোদমে। আজকের খবরের কাগজের শিরোনামা ছিল—কলকাতায় গ্রীষ্ম প্রবাহের প্রথম বলি। তারপর আবার কোর বোর্ডের মত মৃত্যুর খতিয়ান—কানপুর ৭২, বারাণসী ৪০, বারুনপুর ১৭, কৃষ্ণনগর ১০, কলকাতা ১। গতকাল দুপুরে চৌরঙ্গী রোডে জীবনদীপের কাছে একজন বৃদ্ধ ভিখারী মারা গেছে গ্রীষ্ম তাপে। অসীমের এখন সে কথা মনে হল। ডান হাতে ট্রামের হাতলটাকে সুদৃঢ় ভাবে ধরে ও দেহটাকে আলতোভাবে ঝুলিয়ে রাখল এবং অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে অতি পরিচিত রাস্তাঘাট, গাছপালা ঘরবাড়ী ইত্যাদি দেখতে দেখতে চলল। হঠাৎ পোস্টের সঙ্গে ঝোলান একটা সিনেমার ছবির দিকে নজর পড়ল। রাজেশ খান্নার ছবি সম্ভবত, কোন এক নায়িকাকে জাপটে ধরে রেখেছে। অসীম ট্রামের পা-দানীতে যেখানে দাঁড়িয়েছিল তারই পেছনে কাঁচের আড়ালে একটা মেয়ে বসে খুব মনোযোগে সিনেমা পত্রিকার ছবি দেখছিল। অসীম ট্রাম ধরার সময়েই লক্ষ্য করেছে। কেমন খুকী খুকী ভাব মেয়েটার মুখে খেলা করছে। ওর তখন মেয়েটার মুখ দেখার ইচ্ছে করছিল, ও উসখুস করছিল অথচ মেয়েটাকে দেখা সম্ভব হলো না।

পেছনদিক থেকে কে যেন তাকে ডাকছে—মান্ত, মান্ত। এটা অসীমের

আটপৌরে নাম, পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে প্রচলন সীমাবদ্ধ। অসীম অনেক কষ্টে ঘাড় ফেরাল, তাতে দু'জন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের গায়ে চাপও পড়ল অল্পবিস্তর। কিন্তু তারা কিছু বলল না, আজকাল যুবকদের কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে না। অসীম দেখল, পেছনের সেকেণ্ড ক্লাসে ওর মতই ঝুলে ঝুলে যাচ্ছেন মণিদা। মণিদা ওদের পাড়ার লোক। এক সময়ে ভালো ছেলে হিসেবে ভীষণ গ্লামার ছিল পাড়ায়। লেখাপড়ায়ও খুব ভালো ছিলেন। অসীমেরা এখনো মণিদাকে কেমন যেন একটু সমীহ করে চলে। মণিদা বিস্তর তদ্বিরতদারকী করে কোন সরকারী কর্মশালায় কনিষ্ঠ করণিকের একটা কর্ম জুটিয়েছেন বছর দুই আগে। বস্তুত দুদিন আগে অসীম মণিদার ভাগ্যকেও ঈর্ষা করেছে। ইচ্ছা হচ্ছিল এখন মণিদাকে চাকরীর খবরটা জানিয়ে দেয়। অবশ্য এমনিতেই খবরটা পাড়ায় চাউর হয়ে যাবে। মণিদা নিজেই জিজ্ঞেস করলেন—এই-ই কোথা যাচ্ছিস?

—একটা চাকরি পেয়েছি, জয়েন করতে যাচ্ছি।

—কোথা?

—একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে।

পাশের দু'জন লোক ওর মুখের দিকে তাকাল। মণিদা আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—মাইনে কেমন রে? অসীম সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—ভালো। অসীমের ইচ্ছে হচ্ছিল চিৎকার করে মাইনের পরিমানটা জানিয়ে দেয়। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, মাইনের পরিমানটা জানিয়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে একবার দেখে। দেমাকী মেয়েটা ওর দিকে চেয়ে দেখে কিনা। মণিদার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতে অসীমের খুব ভালো লাগল। ট্রামটা হঠাৎ আটকে গেল। সামনে তিন রাস্তার মোড়ে একটা দামি কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের বিশাল হোর্ডিং। ছবিতে একটি নাইটি পরা মেয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পা দুখানাকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছে। শিল্পী মনাই অরূপণ ভাবে মেয়েটির নগ্ন সৌন্দর্য ফুটিয়েছেন। অসীম খুব মনযোগ দিয়ে দেখল। ওর অবনীর কথা মনে হল, অবনীরা এখন কালী কেবিনে আড্ডা দিচ্ছে। অবনীর একটা থিসিস আছে, ও প্রায়শ বলে, পৃথিবীর তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থলের মত জীবনের চার ভাগের তিন ভাগই নাকি যৌনতা। কি জানি। হয়তো বা। হঠাৎ চিন্তার খেই ছিঁড়ে গেল, মণিদা ওর গায়ে ঠেলা দিলেন—আসিয়ে। অনেক লোক নেমে যাওয়ায়

অসীমও একটু আরাম করে দাঁড়াল। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল; ওরে বাস্, মেয়েটা কখন নেমে গেছে। মেয়েটাকে না দেখতে পেয়ে একফোঁটা ছোট্ট দুঃখ যেন ওর বুকের মধ্যে তির তিরিয়ে উঠল। অসীম নীচু গলায় গুন গুন করে সুর ভাঁজল—আ-মি একটা ছো ও ট্ট বা-আপান করেছি—ই-ই-ই···

ট্রাম থেকে নেমে অসীম লোক কাটিয়ে ছুটতে লাগল। ঠোকাঠুকি খেতে লাগল; দশটা বাজতে মাত্র দু'মিনিট বাকি। বাইরের তাপমাত্রা বাড়ছে; গাড়ীগুলি চলছে ছেদহীন ভাবে। এথলেটিক স্পোর্টসের ট্র্যাকের মত লোক পারাপারের জেব্রা। পুলিশের নির্দেশ ঝোলান রয়েছে—জেব্রা দিয়ে পার হোন। অসীম এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, তারপর হানড্রেড্ মিটার রেসের প্রতিযোগীর ফিনিশ দেওয়ার মতো দু'হাত উপরে তুলে লটান ছুট দিল। অনেকে চেঁচিয়ে উঠল গেল গেল! যাবে কোথায়। অসীম ঠিক পার হয়ে গেল। কিন্তু এগোতে পারল না। ফুটপাথ জুড়ে দোকান পসরার জটলা—পেঙ্গুর দোকান, জুতো-সারান মুচি, ভিখারী সব থক্ থক্ করছে। অসীম মনে মনে এদের মুণ্ডুপাত করল, সরকারের মুণ্ডুপাত করল। খানিকটা এগিয়ে দেখল, একটা অন্ধ ভিখারী ফুটপাথ জুড়ে রাবণের ছবি আঁকছে। অসীমের অভ্যেস আছে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুটপাথের ধারে ছবি আকা দেখে, কখনও গান শোনে। এখন এগারশো টাকা মাইনের লোভনীয় চাকরিটা ওকে চাবকাল। ও তেজী ঘোড়ার মতো খাড়া হয়ে দাঁড়াল, এবং সে মুহূর্তে দেখতে পেল ঝকঝকে পিতলের প্লেটে লেখা নামটা—উইলিয়াম জোন্স এণ্ড কোম্পানী ইত্যাদি ইত্যাদি। সুইং ডোরের হাতল ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। আ, কি আরাম! বাইরের ভীষণ গরমের মধ্যেও এখানে কেমন মনলোভা বসন্ত। সামনে রিসেপ্‌সনিষ্টের দপ্তর; অসীম সেদিকে এগিয়ে গেল। রিসেপ্‌সনিষ্ট মহোদয়া হাসি হাসি মুখ করে বলল—ইয়েস প্লিইজ। কণ্ঠস্বর খুব মোলায়েম, কথাটা যেন কোন অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হল। অসীম বুশ সার্টের পকেটে বাম হাতের ছুটো আঙুল গলিয়ে দিয়ে কাগজটা বের করল এবং রিসেপ্‌সনিষ্টের টেবিলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট-লেটারটা রেখে টান টান হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে টেলিফোন ভাষাল করল, সরু লম্বা লম্বা আঙুলগুলি দিয়ে সংখ্যাগুলোর উপর আঙুল বুলোতে লাগল। এ সুযোগে অসীম মেয়েটার মুখ, কপালের উপর আঁকা বিরাট রক্তবর্ণ টিপ, চোখের পল্লবের উপরে মাখা সবুজের আভাটুকু

সযত্নে লক্ষ করল। এবং লোভী দৃষ্টিতে মেয়েটার বুকের এবং পিঠের দিকের অনাবৃত অংশটা এক পলকে দেখে নিল। মেয়েটা কি যেন বলল, ঠিক তেমনি মোলায়েম কণ্ঠে। অসীম এক বর্ণ বুঝতে পারল না। অথচ অসীম মুখার্জী ইউনিভার্সিটির বাঘা বাঘা অধ্যাপকদের কাছে ইংরেজী শিখেছে। সে যা হোক, অসীমকে বুঝে নিতে হল যে, রিসেপ্‌সনিষ্ট ওকে উপবেশন করতে অনুরোধ করেছে। অসীম সোফায় বসল। মনোযোগ দিয়ে মেয়েটাকেই দেখতে লাগল। ওর মুখের গড়ন, চুল বাঁধার ছাঁদ, বুকের কাঁচুলি, যৌবন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে মেয়েটির চোখের সঙ্গে অসীমের চোখের মিলন হয়ে যেতেই ও যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে পারেনা এমনি ক্যাবলার মতো চোখ ফিরিয়ে দেওয়ালে টানান মহাত্মাজীর ছবি দেখতে লাগল। দেওয়ালে তিন খানা ছবি ঝোলান ছিল ; প্রথমটা জনৈক বিলিতি সাহেবের, সম্ভবত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার, মাঝখানে মহাত্মাজীর এবং একধারে একজন মাথায় পাগড়ি শেঠজীর ; সম্ভবত ইনি কোম্পানীর বর্তমান মালিক। অসীমের এমনি বসে থাকতে দারুণ অস্বস্তি লাগল। ও আবার রিসেপ্‌সনিষ্টকে দেখতে লাগল। মেয়েটি বিবাহিত কিনা, ছেলে মেয়ে আছে কিনা, ছেলেকে চুমু খেলে কেমন দেখায়, ওর স্বামী কে, কোথায় থাকে ; কয়লার উনুনে না গ্যাসে রাঁধে, এমনি সব আলফাল চিন্তা করতে লাগল। এক সময়ে অসীম আবিষ্কার করল ও-যে মেয়েটাকে দেখছে মেয়েটা তা বুঝতে পেরেছে। বুঝুকগে। কোন মেয়েই না পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি কামনা না করে। অসীম এমনি প্রায় আধ ঘণ্টা বসে থেকে রিসেপ্‌সনিষ্টকে, লিফটের ওঠানামা, ঝকঝকে মাজাঘসা পিতলের টবে ক্যাকটাস, পাম ট্রি দেখল।

লিফটের মধ্যে দাঁড়িয়ে অসীম নিজেকে আবার একটু নার্ভাস বোধ করল। পিতলের তকমা আঁটা আরদালিটা দু-তিনটে সুইচ টিপল ; অমনি লিফট চলতে লাগল এবং লাল অক্ষরে এক দুই জ্বলে উঠতে লাগল। আরদালিটা খুব সুন্দর এবং সুসজ্জিত সিনেমা হলের মত একটা হল পার করাল এবং দরজা খুলে একটা ছোট ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। ঘরে ঢুকতেই লোকটা হাত বাড়াল। অসীম ঠিক প্রস্তুত ছিল না, প্রথমে থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল, হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখ করে মাথা নাড়াল। আই অ্যাম গোবরধন স্যানিয়াল, লোকটা নিজের পরিচয় দিল। অসীম এবার ভাল করে লোকটাকে দেখল। গোলগাল মুখ, মাথার প্রায় অর্দ্ধাংশ মরুভূমি,

বেশ প্রশস্ত জুলপি কাঁচাপাকা। চোখের তলায় গভীর কালোছাপ। ছোটবেলা থেকে অসীমের ধারণা ছিল যে, যাদের চোখের তলায় কালোদাগ গভীর হয় তারা অসংযমী পুরুষ। পরে অবশ্য জেনেছিল চোখের তলার কালো দাগ নানা কারণে গভীর হতে পারে। তবু গোবর্ধন সান্যালকে অসীমের ইন্দ্রিয় লালসাপরায়ণ পুরুষ ভাবতে খুব ভালো লাগল। ভদ্রলোকের রং বেরং-এর ছাপ দেওয়া বুশসার্ট বয়সের হিসেবে বেমানান মনে হল ওর। হোকগে, মানান বেমানান ইত্যাদি ভাবার কি দরকার! মারো গোলী। বরং গোবর্ধন লোকটা বেশ সহৃদয় এবং হাসিখুশী। অত বয়সেও কেমন চটপটে। অসীম চেয়ারে স্থির হয়ে বসল। ওর যেন কেমন দম আটকে আসছিল। অথচ পরিবেশটা সত্যি মনোরম; কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। কাল দুপুরে চৌরঙ্গীতে একটা ভিখারী গ্রীষ্মতাপে মারা গিয়েছে। মরুকগে। সারা পৃথিবী জ্বলে গেলেও অসীম এখানে বসে বেহালা বাজাতে পারে। তবু ওর অস্বস্তি লাগছে। কেন তা ও স্থির করতে পারল না। অবনী বলে—শালা, তুই নিউরিসিসের পেসেন্ট। হবেও বা। গোবর্ধন সিগারেটের প্যাকিট বের করল, একটি নিজের ঠোঁটে চেপে ধরল, প্যাকিট অসীমের দিকে বাড়িয়ে দিল। অসীম একটু ইতস্ততঃ করে একটা তুলে নিল। গোল্ড ফ্লাক সিগারেট। এতদিন চারমিনার খেয়ে বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছে; এবার থেকে গোল্ড ফ্লাক খাবে স্থির করল। কিন্তু ওর জন্য আরও চমক বাকী ছিল। গোবর্ধন নিজের ড্রয়ার থেকে লাইটার বের করল এবং মুখটাকে অসীমের মুখের একেবারে কাছাকাছি নিয়ে এসে লাইটারে চাপ দিল। লাইটারে চাপ দিতেই অগ্নিশিখার মধ্য দিয়ে একটা উলঙ্গ নারীমূর্তি লাফিয়ে উঠল। অসীম অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। গোবর্ধন হাসল এবং একটানে অনেকটা ধোঁয়া টেনে নিয়ে আবার মৌজ করে ছেড়ে দিল। সিগারেট টানতে টানতে অসীমের অন্ধ ভিখারীটার কথা মনে পড়ে গেল। ভিখারীটা এখনও কি ওই তপ্ত ফুটপাথে বসে রাবণের ছবি আঁকছে? ওর ইচ্ছে হল ভিখারীর বিষয়ে গোবর্ধনকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। পরে নিজে নিজেই ভাবল, গোবর্ধন ওর প্রশ্ন শুনলে নির্ঘাৎ হাসবে। ভাববে, লোকটা ক্যাপা আছে; অসীমের পেছনেই জানালা; জানালা খুলতে যেতেই গোবর্ধন হৈ হৈ করে উঠল—আরে মশাই করছেন কী? দোষটা কোথায় হল তা বুঝতে না পেরে অসীম অপ্রতিভ হয়ে গেল। গোবর্ধন বুঝিয়ে বলল, জানালা খুললে ঠাণ্ডা হাওয়া বেরিয়ে যাবে। অসীম মাথা নাড়াল অর্থাৎ

স্বীকার করে নিল। গোবর্ধন বলে চলল—ঠাণ্ডা মানে কী জানেন? এফিসিয়েন্সি। এফিসিয়েন্সি মানে, জীবন। এবং যতদিন জীবন ততদিন যৌবন। অসীম তন্ময় হয়ে লোকটার কথা শুনল। খানিকটা বুঝতে পারল, খানিকটা বুঝল না। কিন্তু অসীমের মাথায় ওই ঘটনাটাই চক্কর মারছে যে, গতকাল কলকাতায় একজন ভিখারী গরমে মারা গেছে। গোবর্ধন অঙ্গুলি নির্দেশ করে সামনের দিকে দেখাল—এদিকে দেখুন। অসীম প্রথমে কিছুই দর্শনীয় খুঁজে পেল না। পরে দেখল যে চেম্বারের দরজার মাঝখানে খানিকটা জায়গা কাঁচ লাগান। কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরের হল ঘরে বসা অনেকগুলো কর্মীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দু'জন দু'জন করে সার দেওয়া। সামনের সারিতে একটা জুলপিওয়ালা যুবক, বয়সে অসীমের চেয়ে বেশ বেশী, তার পাশেই একটা তরুণী, টাইপ করছে। গোবর্দ্ধন বলল—বুঝলেন না, সব সাব-অভিনেট। ওই যে জুলপিওয়ালা ছোকরাটা, ওর আপনার পজিশনে আসার কথা ছিল। হল না। অসীম কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেন হল না? গোবর্ধন ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল—বুঝবেন না। অসীম তাই স্বীকার করে নিল যে ব্যাপারটা তার বোধশক্তির পরিধির মধ্যে নয়। এক মুহূর্তের মধ্যে গোবর্ধন চৌকস অভিনেতার মতো পালটে গেল, বলল—কী দেখছেন, লুকিয়ে লুকিয়ে, মিস সেনকে? বস্তুত অসীম মেয়েটিকেই দেখছিল, তবু অস্বীকার করল। গোবর্ধন তার টেবিলের সঙ্গে লাগান বেল টিপে দিলে মেয়েটি চেম্বারে ঢুকে পড়ল। গোবর্ধন আবার ভীষণ গম্ভীর, বলল—যে চিঠিটা দিয়েছিলাম হয়েছে? মেয়েটি বেরিয়ে যেতে গোবর্ধন একগাল হেসে বলল—কেমন দেখলেন? তখন অসীম লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

প্রসঙ্গটা অসীমই উত্থাপন করল—আচ্ছা আমায় কি কাজ করতে হবে?

—কিছু না, আমি যা করি তাই।

—আপনি কি করেন?

—দেখলেন না; যেমন ধরুন মনটা খুব খারাপ লাগছে, অফিসের কাজ ভাল লাগছে না, মিস সেনকে সামনে বসিয়ে ডিকটেশন দেওয়া। সাব-অর্ডিনেটরা কাজ করছে কি না, কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখা এবং বল ডাকলে কার্পেট মাড়িয়ে ছুটে যাওয়া, ব্যস।

—আচ্ছা, আপনার বস কোথায় বসেন?

—আমার বস বলেন কেন? তিনি আপনারও বস। তিনটে চেম্বার পরে বসেন।

—তার বস?

—তার উপরের ফ্লোরে।

—তার বস?

— তার উপরের ফ্লোরে।

—তার বস?

তিনি স্বর্গে বসেন। অবশ্য গড আমাদের জি, এম, এর বস কী জি, এম, গডের বস, এটা আমার মাঝে মাঝে ভাবনা হয়।

অফিসার্স ক্যান্টিনে ওরা দু'জন মুখোমুখি বসেছিল। অসীম যতটা দেখল দেওয়াল জুড়ে নগ্ন নারীর ছবির প্রদর্শনী। শিল্প সম্পর্কে ওর ধারণাটা মোটামুটি ভোঁতা বলা যেতে পারে। একবার কোণারকে গিয়েছিল। এগুলিকে সেরকমও মনে হল না; বোধহয় বিলিতি কায়দায় কোন শিল্প টিল্প হবে।

ছবিগুলি দেখতে অসীমের ভালোই লাগল। তবে সলজ্জভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল, কেননা গোবর্ধন আবার কি কাণ্ড ঘটায়। খাবার এসে গেল দু'জনের। বেয়ারা গেলাস সোডার বোতল সাজিয়ে দিয়ে গেল। অসীম আশ্চর্য হল এবং গোবর্ধনকে ফিসফিস করে বলল—মদ দেবে নাকি? গোবর্ধন সদম্ভে হেসে উঠল—হাঁ দেবে, দু' পেগ। তার বেশী নয়। অফিসাররা পায়। আরো বড়ো অফিসার হলে চার পেগ, তার বড়োদের ভরপেট। সুতরাং চার পেগ থেকে ভরপেটের দিকে টার্গেট করতে হবে। বুঝলেন—উপনিষদ বলেছে—নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।

আরে ব্বাস, লোকটা দেখছি একেবারে উপনিষদ আওড়াচ্ছে—অসীম ভাবল। গোবর্ধন ওকে জিজ্ঞাসা করল—কি ওয়াইন আপনার চলে না? অসীমের জবাব দিতে একটু দেরী হল। শেষে কায়দা করে জবাব দিল—না, ঠিক অভ্যেস নেই। অবশ্য অসীম এর আগে দু' একবার খেয়েছে। একবার পিকনিকে অন্যবার বন্ধুদের সাথে বারে গিয়ে। বারে খেয়ে বসের গায়ে বমি করে দিয়েছিল। শুনে কেয়ার কি রাগ।

খাওয়া ঠিক অভ্যেস নেই? গোবর্ধন যেন কিঞ্চিৎ সন্তুষ্টই হল। তবু বলল—একটু একটু করে খান, অভ্যাস করুন, আরে মশাই আজকালকার

কলেজ গার্লরা খাচ্ছে। গোবর্ধন সামান্য পরিমাণ অসীমের গেলাসে ঢেলে দিয়ে বাকিটা নিজের গেলাসে ঢালল এবং পরিপাটি করে খেল। গোবর্ধনের চোখগুলো কেমন গোল গোল হয়ে গেল। ও একটু জোরে জোরে শ্বাস ছাড়তে লাগল। আর সব অবিকল ঠিক। হঠাৎ অসীমের কানের কাছে মুখ এনে সঙ্গোপনে বলল—মিঃ মুখার্জী, একটা কথা বলব, ঠিক জবাব দেবেন? অসীম ভাবল এমন আবার গোপন কি কথা থাকতে পারে। গোবর্ধন অনেক ভণিতা করে বলল—আচ্ছা, দাশগুপ্ত সাহেবের সঙ্গে আপনার কি রিলেশন? অসীম কিছুই বুঝতে পারল না—কোন দাশগুপ্ত সাহেব? গোবর্ধন মুহূর্তের মধ্যে সংযত হল, বলল—না, ঠিক আছে, আপনার বলতে হয়ত অসুবিধা আছে। তবে অফিসে সব্বাই জানে আপনি দাশগুপ্ত সাহেবের লোক। দাশগুপ্ত সাহেব আপনার চাকরি করে দিয়েছেন।

যদিও অসীম কোন দাশগুপ্ত সাহেবকে চেনে না। এমনি কোন মুরুব্বির কথা তার জানা নেই। তবুও ভাবল, কি জানি হয়তো সে দাশগুপ্ত সাহেবেরই লোক। কেননা বিনা সুপারিশে এমন জবর চাকরি হয়; ও নিজেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না। তবে পুরোপুরি বিষয়টাই ওর কাছে কেমন আজগুবি ঠেকল।

দু'জন চেম্বারে ফিরতেই টেলিফোন বাজল। গোবর্ধন টেলিফোন ধরে অনেকক্ষণ নানা কথা ভীষণ উত্তেজিতভাবে বলল। তারপর অসীমের সামনে একটা চিঠি দিয়ে বলল—আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আপনি মিস সেনকে ডেকে একটা ডিকটেশন দেবেন। মাল রিলিজ না হলে কিন্তু কোম্পানীর হেভি লস হবে। এইসব বলে গোবর্ধন দ্রুত বেরিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এলো এবং অসীমের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিভৃতে বলল—তবে বুঝলেন, মিস সেন মেয়েটা সুবিধের নয়, ফাওাল আছে বুঝলেন, তাছাড়া আপনার গার্ডিয়ান দাশগুপ্ত সাহেবের ভীষণ নজর ওর ওপর। এই কথা বলে সামান্য থামল এবং পুণরায় বেরিয়ে যাওয়ার আগে চেঁচিয়ে বলল—এনিওয়ে উইশ ইউ গুড লাক।

দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই অসীম একা একা বলল; তাকাতেই কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখল মিস সেন মনোযোগ দিয়ে কি যেন টাইপ করছে। ওর পরণে হলদে ছাপ দেওয়া ছাপা শাড়ী, ম্যাচিং কালারের ব্লাউজ যৌবন আটকে রাখতে পারছে না, বস্তুত ব্লাউজটা রিলেপলনিষ্টের ব্লাউজ এর মতই সংক্ষিপ্ত, তারি নিভৃত শাড়ীর

 P29397

বন্ধনে হাঁসফাঁস করছে। দেহের সমস্ত অবয়বই যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের পুষ্ট। অসীম ওর নখের এবং ঠোঁটের বর্ণবিন্যাস লক্ষ্য করল। কানে গোবর্ধনের কথাগুলো ফিসফিসিয়ে বাজল—বুঝলেন, ছাওাল আছে মনায়। এখুনি জরুরি চিঠিটা ডিকটেশন্ দেওয়া প্রয়োজন। না-হলে মাল ডেমারেজ খাবে। কোম্পানীর লাভের পরিমাণ কমবে। লাভ কমলে—সব বন্ধ, ব্লাক নাইট হুইস্কি, ম্যাক্স, এমনকি এগারশো টাকা মাইনের চাকরীটাও। তাহলে মিস সেনকে ডাকতে হয়! অসীম একটু নড়াচড়া করে বসল। মনে মনে চিঠিটার একটু মক্শ করে নিল, পাছে একটা যুবতীর সামনে অপ্রস্তুত হতে হয়। যদি গলা কেঁপে যায়। একজন তরুণ আর একটি তরুণী, একটা খুপরি ঘরে; আগুনের সম্মুখে ঘৃত। হোক না। গোবর্ধন লোকটা একটা লায়ার, শালা ছাওাল মনায়। যদিও মিস সেনের ব্লাউজটা খুব খাটো মাপের, যদিও ওর দেহের পেছনের দিকটা একটু বেয়াড়া রকমের বড়োসড়ো, তবুও একজন ভদ্রমহিলা চাকরি করতে এসেছেন। তাছাড়া অসীমের বাবা ওর মাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসেননি এবং অসীম কেয়াকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। একটা বছর ঠিক ঠিক মত কাজ করতে পারলে অসীমের মাইনেটা এক লাফে গিয়ে পনের শ'য় পৌঁছুবে। তখন? আহা। কেয়াকে লাল চেলিতে কেমন মানাবে। অসীম ফুলসজ্জার রাতে কেয়ার ঠোঁটে মুখ ডুবিয়ে চুমু খাবে।

গা গুলাচ্ছিল অসীমের; কয়েক ফোঁটা মাত্র মদ খেয়েছে, তার জন্য নিশ্চয়ই নয়। বেলটা কখন টিপে দিয়েছিল। দরজা ঠেলে মিস সেন ভিতরে ঢুকে পড়ল; ও মিটিমিটি হাসছে যেন। বলতে ওর উন্নত স্তনজোড়া যেন অসীমের সামনের টেবিলে ঠেকে গেল। অসীম খুব গম্ভীর হবার চেষ্টা করল—টেক ডাউন। কি সর্বনাশ। বমি হয়ে যাবে নাকি? জাস্ট এ মিনিট প্লিজ; অসীম সুইং ডোর ঠেলে পাগলের মত বেরিয়ে পড়ল। লিফটের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে সব কয়টা বোতাম একসঙ্গে টিপে দিল।

চলৎশক্তিহীন বন্ধ লিফটের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অসীম নিজেকেই প্রশ্ন করল—আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? এর কোন মানেই হয় না। অসীম নিজের সঙ্গেই নিজে বাদানুবাদ করল। ও বলল—আমার কিছু বক্তব্য আছে। বস্তুত চলমান ট্রাম বাস বন্ধ করে দিয়ে ট্রাফিক পুলিসের দাঁড়ানোর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে—আপনারা আমার কথা শুনুন।

আজ আমি চাকরিতে যোগ দিতে আসতে যেসব দেখেছি—যেমন রাজেশ খান্নাকে ছবিতে ; খুকি খুকি মুখ একটা মেয়েকে ট্রামে, মণিদাকে ট্রামের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে, নাইটি পরে উপুড় হয়ে শোয়া মেয়েটিকে হোর্ডিং-এ, একটা অন্ধ লোককে রাবণের ছবি আঁকতে এছাড়া রিসেপশনিষ্টকে, গোবর্ধন সান্যালকে মিস সেনকে এবং যাদের চিনি না এমনি আরো অনেককে, কি জানি কেন আমার মনে হচ্ছে, এই আমরা সকলে অর্থাৎ আমি, রাজেশ খান্না, অন্ধ ভিখারী, মণিদা, গোবর্ধন স্যান্যাল, মিস সেন, কেয়া সকলে এক শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আছি। সুতরাং পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের যত গল্প, তাবৎ তাবৎ মহামানবদের সুভাষিত, যতো কিছুই পড়ো না কেন, যে সত্যটা আমার কাছে অবারিত হল তা হল এই—কোম্পানী আমাকে অর্থাৎ অসীম মুখার্জীকে কাজে বহাল না করে যদি অবনীকে বহাল করত এবং মিস সেনকে বহাল না করে কেয়াকে করত তাতে তার লাভ লোকসানে কোনই ব্যত্যয় ঘটত না। কোম্পানী যেমনি চলছে তেমনই চলত। সুতরাং এখন, এই মুহূর্তে, আমার সাধের চাকরিটার পাছায় লাথি মারতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হঠাৎ লিফটের আলো জ্বলে উঠল। নাগর দোলায় চড়লে যেমন লোক টলমল করে তেমনি অসীম টলতে লাগল। লিফটা চলছে। অসীম অবশ্য বুঝতে পারল না যে সে উপরে উঠছে, কিম্বা নিচে নামছে। লিফটের দরজা খুলে যেতেই দেখল, সামনে গোবর্ধন। কি মিঃ মুখার্জী, আপনি এখানে? অসীম আমতা আমতা করল—"হঁা, না, মানে···এখানে ··। গোবর্ধনের পাশে এক বেঁটে ভদ্রলোক গম্ভীর মুখ করে অসীমকে দেখছিল। লোকটাকে ডি. আই. পি. ডি. আই. পি মনে হচ্ছিল ; বাশগুপ্ত সাহেব নাতো। অসীম রেসের বাজীমারা ঘোড়ার মতো টান টান হয়ে দাঁড়াল। ওকে উইস করা দরকার—গুড আফটারনুন স্যর। হঠাৎ ভদ্রলোক ছুটতে শুরু করেছেন কার্পেটের উপর দিয়ে। তার পেছন পেছন গোবর্ধনও ছুটছে। অতএব, অসীম মুখার্জিও গোবর্ধন সান্যালকে অনুসরণ করল।

দিলীপ সেনগুপ্ত

অপহরণ

পেছন দিকে প্রায় হাত পঞ্চাশেক দূরে কোন এক কিশোরী অপটু সুরে গান গায়। ওর সুর ভেসে আসে এখানে। এখান থেকে আর এগোতে পারে না। বঁড়শিবিদ্ধ মাছের শেষ আছাড় খাওয়ার মতো এতখানি ভেসে-আসা গীত-ধ্বনির আচমকা পতন ঘটে। চক্রের ধ্বনি কোলাহলে। যদি গানের না হয়ে রণ-হুঙ্কারের হত, তবুও হেরফের কিছু হত না। নিজেদের নিয়ে মশগুল একপাল চঞ্চল প্রাণের হট্টগোলে কোন কিছুই থেই পায় না। বিশ্বের তাবৎ সঙ্গীত, হুঙ্কার আর বিতণ্ডাকে কলা দেখিয়ে ওরা নিজেদের নিয়ে অবাধে মত্ত থাকে।

ওরা সংখ্যায় দশজন। বা তারও বেশি। সকলে কথা বলতে জানে। বলেও। ওরা কেউ নকুল, কেউ সমীর, কেউ মলয়। আবার বাবু, খোকা, রাম কিংবা শ্যাম। যদু, ভোলাও আছে।

বেলা যত বাড়ে। সংখ্যা তত বৃদ্ধি পায়। এক, দুই করে দশ থেকে বারো অবধি। শেষে পনেরোতে দাঁড়ায়। ধরিত্রী বিভক্ত হয়। আলাদা একটি একপেশে জগৎ এদের নিয়ে গড়ে ওঠে। সে জগতে না আছে রাজা, না আছে মন্ত্রী।

'আমি বলছি ওয়ার লাগবে।' সমীর বলে।

'না-ও লাগতে পারে।' রামের মৃদু আপত্তি।

'কেন? লাগবে না কেন? শরণার্থীরা তবে ফিরবে কি করে?' প্রশ্ন তোলে যদু।

'ওরা আর যাচ্ছে না বাবা। থাকবে ইণ্ডিয়াতেই।'

'ইন্ডিয়েট। কলা বুঝিস্।' অন্য পাশ থেকে ধমকে ওঠে শ্যাম। আর অল্পদূর থেকে—'আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে'—গান আসে ভাসতে ভাসতে। এইখানে ডুবে যায়। 'কলা বুঝিস' মন্তব্যের পর বিষয়ান্তরে যেতে হয়। আলোচনাকে জটিল করে তুললে নিজেদেরই লোকসান। জট খোলার কষ্ট ভোগ করতে হবে। ওইসব কষ্ট ওদের সয় না।

সাধন কাকুর চা-পানের দোকানটাকে বাঁয়ে রেখে বেচু ঘোষের খাটালের সামনে বস্তির মুখোমুখি ওরা আসন গেড়ে বসে। চিলড্রেন পার্কের ভেতরে ঘাসের চিহ্নটুকু নেই। পার্কের বাইরে তবু কিছু ঘাস আছে। কিছু শুকনো। বৃদ্ধের মাথায় পক কেশের মতো। ওই সামান্য ঘাসে ওরা গোল হয়ে বসে। চিলড্রেন পার্কে শিশুরা আসে না। একটা বুড়ো কদম গাছ আর সিমেন্টের বেঞ্চি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। শিশুদের বয়ে গেছে এখানে আসতে। ওরা শিশু নয়। কিশোরও নয়। তারও উর্দ্ধে। নিজেদের স্থান নিজেরা করে নেয়।

'এ বছর ফিস্ট হবে না?' কথা তোলে বাবু।

কি বছরে ফিস্ট হয়। সঙ্গতি বুঝে ব্যবস্থা। কখনও অল্পদূরে। কখনও অনেক দূরে। একটা বিশেষ দিন কেটে যায়।

'আলবৎ হবে।' এক সঙ্গে সায় দেয় কয়েকজন। সুরু হয় আলোচনা। শীত ভালো করে জাঁকিয়ে বসার আগে বড় দিনের ছুটির অন্তত পক্ষে ষোলটা ঘণ্টা মজায় কাটাবার পাকাপাকি একটা বন্দোবস্ত। মত-বদলে, ঝগড়ায়, তর্কে-বিতর্কে আর পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত হয়েই যায়। সময় লাগে অনেক। বেলা নটায় রোদ অর্ধেক ঘাস ভরিয়ে দেবার পর যদি কথা উঠে থাকে, ঘণ্টা হতে হতে পুরো ঘাস, চারপাশের রাস্তা রোদে ভরে যায়। মুদি দোকানের বুড়ো স্থপতি-দাদু দোকানের সামনে বিছানার চাদর টাঙিয়ে দিয়ে ছায়ায় বসে বিড়ি টানে। বেলা বারো বেজে যায়। ওরাও ওঠে।

ফেরার সময় নেতাজী স্কুলের দালান-বাড়ি থেকে গম্ গম্ আওয়াজটাকে শুনতে শুনতে যায়। অঙ্কে ধারণ করে। গম্ গম্ শব্দ বড় পরিচিত। কে জানে আগে যখন ওরা এই স্কুলে পড়ত, বাইরের পথচারী এমন শব্দ শুনতে পেত কিনা? নিজেরা কি শুনত? মনে নেই। এই সেদিনের কথা। তবু স্মরণে আনা যায় না।

স্কুলের প্রাক্তন পনেরোটি পড়ুয়া শুটি শুটি দরজা ঠেলে যে-যার ঘরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এই ভাবেই কাটবে, না, রদবদল কিছু হবে? কেউ কেউ কলেজে যায়। কলেজ শেষ হয়ে গেলে কোথায় যাবে। সাহস করে সে ভাবনা ভাবে না। ও কথা ভাবতে নাকি বুকে বল লাগে। তার চেয়ে বরং বিকেলের প্রার্থনা করা ভালো। বিকেল হবে। ওরা আবার ওইখানে গিয়ে বসবে। চিলড্রেন পার্কের বাইরে অল্প ঘাসের উপর।

'আদর্শ পল্লীর নাচুনেকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না?' আবার কথা ওঠে। বিষয় একটু অন্য রকম! ঝুঁকে বসে সকলে।

'কেন? কোথায় গেল?' শ্যাম ব্যস্ত হয়।

'কারা নাকি বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেছে।' জবাব দেয় মলয়। ভীষণ আস্তে। ভয়ানক ধীরে।

'কবে?' জিজ্ঞেস করে সমীর। প্রশ্নটায় চমকে ওঠে সকলে। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। জবাব দেয় না কেউ। এর জবাব নেই। কেউ জানে না। তবু প্রশ্ন ফুরোয় না। যক্ষা রোগীর ক্লিষ্ট কফের সঙ্গে অবধারিত রক্তের মতো আরেকজনের প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, 'কারা নিয়ে গেছে?' কেউ কথা বলে না। মাথা নিচু করে ঘাস দেখে। সাধন কাকুর পান সাজা দেখে। কিংবা মন দিয়ে পেছনের নিকটবর্তী ঘর থেকে কিশোরীর কাঁচা কণ্ঠের ভেসে-আসা গান শোনে—'বসিয়া আছো কেন আপন মনে—'এবারে ওরা এই সুরকে আরও দূরে ভেসে যেতে দেয়। শুধু ভিড় পেরিয়ে গান চলে আরও উত্তরে। এমন বড় হয় না। গানকে ওরা ওদের কাছ থেকে যেতে দেয় না; নিজেদের কোলাহলে ডুবিয়ে মারে। এখন কোন কোলাহল নেই। নিবন্ত আগুনের মতো নিস্তেজ। মাঝে মাঝে ফসফস আলাপ। কারো নাক থেকে, কারো বুক থেকে হাওয়া বের হয় নিশ্বাসের হাওয়া।

মাছ ধরার জাল বুনতে বুনতে একমনে হেঁটে যায় ছেলে-পাড়ার বিনোদ। ওদের দিকে বিনোদের চোখ পড়ে না। পড়লেও কোন পক্ষেরই আসে-যায় না কিছু। আগের পয়সা না মিটিয়ে আবার ধার চাইতে আসা গরীব খদ্দেরের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেছে সাধন কাকুর। সাধনকাকু তার দারিদ্র্য মানতে নারাজ। বলে, 'সব কাজ চলে, আর আমার পয়সার বেলায় শুকিয়ে যায়। হবে না। ধার-বাকি হবে না। এবার থেকে বাকি একেবারে বন্ধ। ফেলো কড়ি মাখো তেল।' অপরদিকে মৃদু প্রতিবাদ করতে যায়। কাকুর গলা চড়ে যায় আরো। আর পশ্চাতে তখন গানের এক ঢেউ শেষ হয়ে আর এক ঢেউএ কেনা ওঠে—'আমি তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ, সুরের বাঁধনে।' এরপরে বোধহয় আর গাইবে না কিশোরী। এর পরে আর কিছু থাকতে পারে না গাওয়ার। বেলা পড়ে গেছে। এবারে গায়িকার বিশ্রাম। ওরাও উঠবে।

ওঠেও। একেবারে নিঃশব্দে। নেতাজী স্কুলের গম্‌গম্ আওয়াজকে একটু যেন দ্রুত পাশ কাটায়।

ঘরে ফিরে বিকেলের প্রার্থনায় আর যেমন মন দিতে পারে না।

'আদর্শ পল্লীর নাণ্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

প্রশ্নটা মুখ থেকে এই প্রথম বেরিয়েছে। এর আগে কখনও এই রকম কথা এই ভিড়ের মধ্যে ওঠেনি। তবু কোন চুক্তি নয়, অঙ্গীকার নয়, প্রতিজ্ঞা নয়, এমনিতেই সব মনগুলো এক হয়ে নিশ্চুপে এই ঘাসের ওপর ঠিক করে নিয়েছিল. অপহরণের সংবাদ, হত্যার খবরে ওরা কান দেবে না। নাক গলাবে না। মন্তব্য করবে না। তাতে ওদের অসুবিধে। এ বড় জটিল ব্যাপার। ওদের সাধ্য নেই তার বিশ্লেষণ করে। যার বিশ্লেষণের ক্ষমতা নেই তার আলোচনাও এরা এড়িয়ে যাবে, এটাই ধরে নেওয়া ছিল। কোন পৃথক বৈঠকে নয়। এমনিই। জটলার নিয়মে। যে জটলা ব্যতিক্রমকে আহ্বান করে, যদি সে ব্যতিক্রম অঙ্গমুক্ত হয়, জীবন্মুক্ত হয়। যে আশ্চর্য আকর্ষণে ওরা রোজ এখানে আসে, গল্প করে, ভাবে, গুনগুন করে সেই আকর্ষণেই এই অপহরণের সংবাদে ওরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নীরব চাঞ্চল্য। মুখ ফোটাতে মানা। বিশেষ কেউ মানা করে দেয়নি। কারো কাছে এর জন্য পাঠ নিতে হয়নি। তবু ওরা নিশ্বাস নেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। যে অপহরণের কারণ ওদের কাছে অজানা, যার উৎসের ওরা খেই পায় না। ভয়ানক এক আতঙ্কে তার দিকে ফিরেও তাকায় না। তথাপি নাণ্টুর দুঃসংবাদ ওরা চেপে রাখতে পারে না। বেরিয়ে আসে।

এমন যেন ওরা আঁচ করেছিল, এমন ভয়ই যেন করেছিল ওরা। আবার মনে মনে অদ্ভুত দুঃসংবাদটাকে দূর দূর করে আসছিল। ঈশ্বর! এমন যেন, না ঘটে? এই রকম কামনা ওরা কখন কোন্ মুহূর্তে সময়ের পাঁকে ডুব মেরে করে ফেলেছিল, তা নিজেদেরই মনে নেই। চকিত হয়ে ওঠে এখন।

'এ সব না করলে কি চলে নারে মলয়?' বিকেলের বৈঠকে রাম প্রশ্ন করে মলয়কে।

'এসব মানে? কোন সব?' মলয় পাল্টা জানতে চায়।

'এই যে নাণ্টুকে—'

আর বলতে হয় না। বুঝতে পারে সকলে. কি বলতে চায় রাম।

'যাক ছেড়ে দে—' এই পর্যন্ত বলে নিজেই বিষয়কে ছাড়তে পারে না নকুল। আবার বলে, 'নাণ্টু কিন্তু বেশ ভালো ছেলে রে—।'

সকলে বোঝে আলোচনা ধীরে ধীরে একটা বিশেষ দিকে ধাবিত হচ্ছে, যদিও এখুনি দিগ্‌নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

পেছন-বাড়ির কিশোরী এখন গাইছে না। এটা রেওয়াজের সময় নয়। সঙ্গীত চর্চার কাল নয়। তবু সকলে যেন আকাশের দিকে চেয়ে সঙ্গীতের প্রার্থনা করছে। এখন গান হোক্। একটা অপহরণের সংবাদ সঙ্গীতের ঘায়ে আত্মঘাতী হোক্।

বস্তির কুঁড়েঘর থেকে কথা-বলার হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। ওরা পনের জন তাই শুনল। কিংবা শুনল না। বিশেষ কোন কিছু হয়তো শুনছে না কেউ। তবু সান্ত্বনার একটা ঝংকার বেজে উঠুক, এমনি প্রতীক্ষায় কান পেতে থাকল।

নাণ্টু ওদের কেউ নয়। নাণ্টু এই জটলার শরিক নয়। সে কখনো ওদের সঙ্গে বনভোজনে যায়নি। তবু তার জন্য থেমে আছে সকলে। তাকে পাওয়া গেল কিনা, এ সংবাদটা যেন ওদের কাছে ভীষণ জরুরি।

'ওরে নিতাই বেয়োস্‌না এখন। দিন-কাল ভালো নয়।' বস্তির এক জানালা খান খান করে নিতাই-এর বুড়ি মার চিৎকার ওদের কানে লাগল।

একটু নড়ে বসল সকলে। দিনকাল ভালো নয়—এইটেই যেন এই বিকেলে সব থেকে খাঁটি কথা। সত্যি সংবাদ। নইলে নাণ্টু ভালো ছেলে বলে এরাও জানে, হারিয়ে যাবে কেন?

'পাশ করে করবে কি?'

পরীক্ষায় ফল বেরোবার আগে হিতৈষীজনেরা এমন প্রশ্ন করেই থাকে। ওরা যে-যার মতো করে জবাব দিয়েছে নিশ্চয়ই। এ কথাটাতো বলা হয়নি—'যদি অপহৃত না হই, তবে অমুক হব।

এই অপহরণই যেন এ সময়ের বিধি। আজ নাণ্টু গেল। কাল নিতাই যাবে। যাকে তার মা ঘর থেকে বাইরে বেরোতে নিষেধ করেছে সকলকে শুনিয়ে। যদি সত্যি আর না ফেরে। তবে এই পনের জনকে সাক্ষী মানতে পারবে।

'ছাখো বাছারা—তোমরা তো শুনেছো আমি নিতাইকে মানা করেছিলাম বেরুতে। ছেলে আমাকে গ্রাহ্যি করলে না—আমল দিলে না ভাসিয়ে দিয়ে গ্যালো আমায়—ভাসিয়ে দিয়ে গ্যালো।'

সাধনকাকু চায়ের দোকানে বসে বসে এন্‌তার কেশে চলেছে। বেশি

বয়সের নিয়মিত কাশি, উৎকণ্ঠার কিছু নয়। ওই কাশির শব্দ আর একখানা পুলিশ ভ্যানের ভোঁস ভোঁস আওয়াজ এক সঙ্গে মিশে গেল। ওরা দেখল, পুলিশ যাচ্ছে, যেদিকে নাণ্টুর বাড়ি সেইদিকে। যেতে যেতে মুখ বাড়িয়ে গোল হয়ে বসা পনেরো জনকে দেখে গেল মনোযোগ দিয়ে। একটা মুখকেই দেখল যেন।

'আদর্শ পল্লীর নাণ্টুদা ভেসে উঠেছে জানিস্? কে যেন খুন করেছে।' চিলড্রেন পার্কের বাঁধানো বেঞ্চে দুই কিশোরের আলাপ এখানে, ওদের মধ্যিখানে সপাং করে বেজে উঠল। ওরা নড়ে-চড়ে উঠল। এখুনি উঠতে হবে, আর এখানে নয়।

পুলিশের গাড়ি ফিরে আসার আগে স্থানটি ফাঁকা হয়ে গেল। কিছু মড়া আর কিছু সবুজ ঘাস প্রায় জড়াজড়ি করে জেগে রইল ওদের পরিত্যক্ত বসার স্থানটিতে।

নেতাজী স্কুলের নিঃঝুম দালান বাড়িখানা পার হতে হতে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল, 'কাল কখন আসচিস্?' পারে নি, কেউ না। কাকুকে নয়।

পরের দিন কেউ আসেনি। তার পরের দিনও না। এদিকে অপহরণের সংবাদ, ভেসে ওঠার সংবাদ, মরে যাওয়ার সংবাদ ক্রমাগত ছড়াতে লাগল এদিক থেকে ওদিকে। চতুর্দিকে।

ওরা আর আসেনি। অপহৃত কিনা তা জানা যায়নি। নিতাই হারিয়ে গেলে নিতাইর মা আর সাক্ষী মানার লোক পাবে না। যারা সাক্ষী হতে পারত, তারা কেউ এখন এখানে আসে না। বলতে পারবে না, নিতাইকে বেরোতে বারণ করেছিল ওর বুড়ি মা।

মদন দাশ

পার্শ্বচরিত্রের নায়ক

শুধুমাত্র দেওয়াল ঘড়ি টিক্‌টিক্ শব্দ করছিল। আর কোন শব্দ নেই। নিঃশব্দ অফিস চেম্বারে সে দাঁড়িয়েছিল বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এপারে। শেড্‌ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত টেবিল। মিস্টার সেনের মুখ আলোর সীমানার ওপারে। টেবিলের খোলা ফাইলে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। দাঁতের ফাঁকে পাইপ। পাইপ থেকে সূক্ষ্ম এক ধোঁয়ার রেখা উঠছিল পাকিয়ে পাকিয়ে। বাতাসে তামাকের গন্ধ। মাথার ওপর সিলিং ফ্যান মৃদু শব্দ করছিল। উত্তেজনায় তার বুক ধক ধক করছিল। কয়েকটি মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে নিজেকে সংযত করতে চাইল। তারপর—

—মিস্টার সেন আপনি অবিনাশবাবুকে খুব আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছেন। কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে সে কথা বলতে চাইল কিন্তু ঈষৎ কাঁপল যেন।

নিঃশব্দ চেম্বার। টিক্ টিক্ শব্দ শুধু। খস্ করে একটা কাগজ ওল্টানোর শব্দ হলো। আরও কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত।

—মিস্টার সেন, আপনি অবিনাশবাবুকে—

—গো এণ্ড অয়েল ইওর ওন্ মেশিন। শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভঙ্গী পরিবর্তন করল না, শুধুমাত্র কয়েকটি কথা চিবানো পাইপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো।

—আমার কথার উত্তর আমি পাইনি। যদিও তার কানের পাতায় ঝম্‌ঝম্ শব্দ করছিল রক্তের উচ্ছ্বাস তথাপি সে সংযত গলায় কথা বলল।

—এটা আপনার ব্যাপার নয় সুতরাং—

—না হতে পারে, কিন্তু আমাদের ব্যাপার, এটা আমাদের সকলের অপমানের ব্যাপার, আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

—কার কাছে? আপনার কাছে নাকি?

—না, অবিনাশবাবুর কাছে।

—লিভার হওয়ার চেষ্টা করছেন?

—আপনি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করলে আমিও অপমানকর কথা বলতে বাধ্য হবো।

—স্টপ্ ইট্ এণ্ড গো। টেবিল চাপড়ে প্রায় গর্জন করে উঠলেন তিনি। সে দাঁতে দাঁত চাপল, হাত মুঠো করল। খুলল। বেরিয়ে এলো।

বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে সে বিভিন্ন টেবিলের পাশ দিয়ে সরু পথগুলি পেরিয়ে চেয়ারে এসে বসল। ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখল। সকলের চোখে জিজ্ঞাসু ভাব ছিল, কিন্তু কেউ তার কাছে উঠে আসছিল না। কিংবা জিজ্ঞাসা করছিল না—কি হলো। আবহাওয়া থমথমে। সে অবাক হচ্ছিল সকলের মুখে কেমন একটা ভীতু ভীতু ভাব। অবিনাশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, তার কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন, আমার জন্য কতগুলি বাজে কথা শুনে এলেন তো? কেন গেলেন ভাই? সবই আমার কপাল। ওতে আমার কিছু আসে যায় না।

মুখ তুলে তাকাল সে। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখল। মনে হয় তাঁর শরীরে যথেষ্ট রক্ত নেই। গাল এবং গলার চামড়া জীর্ণ হয়ে কুঁচকে গিয়েছে। তাঁর মুখের দিকে তাকালে কেমন মায়া হয়। অথচ এই দাম্ভিক লোকটি কি অনায়াসে এই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে কতগুলি বাজে কথা বলে হাতের ফাইল ছুঁড়ে টেবিলে ফেলে দিয়ে গেলেন। যেন ফাইল ছুঁড়ে মারতে চাইলেন। তার তিরিশ বছর বয়সের রক্ত চন্ চন্ করে উঠল। সে প্রায় গর্জন করে উঠল, অবিনাশবাবু! কপাল দেখাবেন না। এটা মেনে নিলে এরপর উনি আমাদের প্রত্যেককে এভাবে দাবাবেন। আগে যে সেকশনে ছিলেন সেখানে ওনার অনেক বদনাম আছে। এখানে এসে প্রথমেই আমাদের ওপর শাসন চালাতে চাইছেন, কিন্তু এটা মেনে নেওয়া যায়না। অবিনাশবাবু ঘাড় কুঁকিয়ে কথাগুলি শুনলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে হেঁটে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তার হাঁটার ভঙ্গী কেমন দুর্বল।

সে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখল। দেখল, অনেক অবিনাশবাবু যেন বসে, এক অবিনাশবাবু যেন অনেক হয়ে গিয়েছেন, শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, গায়ে যথেষ্ট রক্ত নেই, গাল এবং গলার চামড়া জীর্ণ হয়ে কুঁচকে গিয়েছে। তারা বছরের পর বছর শান্ত শিষ্ট রক্তধারা শরীরে নিয়ে অতিবাহিত করছে। জীবন আক্ষেপে আ-ক্ষে-পে সহসা সে তার সামনে রূঢ় ভবিষ্যৎ দেখতে পেল। সে এক বিশাল গহ্বর দেখল যেন। তার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। তার মা

কিছুদিন ধরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ বিয়েটা তার কন্যা দরকার একথা সে বোঝে। কি এক পদধ্বনি মাঝে মাঝে ভীষণ ভাবে মেহমনে নাড়া দিয়ে যায়। একটা ব্যাকুলতা বুক আকুল করে। কিন্তু তারপর? স্ত্রী সন্তান ভবিষ্যৎ? সন্তানের জন্য যথেষ্ট খাবার নেই। স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট খাবার নেই। নিজের জন্য যথেষ্ট খাবার নেই। অভাব অপুষ্টি অসুস্থতা এবং ভবিষ্যৎ। সন্তানের ভবিষ্যৎ—হাতে তার মাসান্তে গোনা কড়ি। তার সাধ্য কতটুকু। সন্তানের সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য ব্যয়? তার সাধ্য কতটুকু! সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়? তার মনে হলো তার দৃষ্টি কেমন ঝ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। সে ঘাড় তুলে দেখল সবাই ভীষণ মনোযোগ দিয়ে কাজে ব্যস্ত। যেন একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর তাদের প্রত্যেকের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দেখলেই গর্জে উঠবে। কোথাও কোন শব্দ নেই পৃথিবী নিথর এবং নিথর এবং নিথর। তার মনে হ'লো বিশাল নিথর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে তারা কসিল হয়ে আছে····

সহসা একটা চেয়ার টানার শব্দ হলো। সে একটু প্রকৃতিস্থ হলো এবং দেখল সতীশবাবুর টেবিলের সামনে বেয়ারা দাঁড়িয়ে। সতীশবাবু চেয়ার ঠেলে উঠেছেন। বেয়ারার পিছন পিছন এগিয়ে চললেন। কোন দিকে তিনি চোখ ফেরাচ্ছিলেন না, সোজা হেঁটে চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন। সকলের মুখ তার অপসৃয়মান শরীরের দিকে ফিরেছিল, এখন যে যার ঘাড় ফেরাল।

সে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল। তাদের মনের ভাব যেন সে পড়তে পারছিল। তারা প্রত্যেকেই কি ভাবছিল না যে তাকে কেন ডাকা হলনা? তারা কি প্রত্যেকে ওই ঘরে ঢুকে মন রাখা কথা বলার জন্য আকুল হচ্ছিল না? আহা। সতীশবাবু যেন কি এক মূল্যবান বস্তু এখন ঐ ঘরে গিয়ে পেয়ে যাবেন; এবং প্রত্যেককে বঞ্চিত করবেন। সে তার চারপাশে অনেক সতীশবাবুকে বসে থাকতে দেখল যাদের মুখের ভেতর একটা ছাংলা জিহ্বা লক্ লক্ করছিল। দেখলে দেখলে। ব্যাটা ঠিক চুকলি করতে গেল—তার দিকে মুখটা একটু এগিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন কমলবাবু। সে ম্লান হাসল, সতীশবাবুই বা সারাজীবন কী পেয়েছেন, তাঁর সাহেবদের কাছে চুকলি কেটে? পিঠোপিঠি দুই মেয়ের বড়টির বিয়ে দিয়েছেন যেখান থেকে যতটুকু সম্ভব ধার করে। তারপর? পরেরটির জন্য কি ব্যবস্থা করবেন? দুপুরে সতীশবাবু টিফিন বাক্স খুলে রুটি খান আর একটু তরকারী দিয়ে। তখন তিনি তাঁর দুঃখের কথা বলেন। সে কথাগুলিতে কোন ঝোঁঝাল নেই। চকচকে টাকে

বাঁ হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, দেখ ভাই, একফোঁটা ঘি মাখানো না হলে আমার গলা দিয়ে রুটি নামে না রে। মাসে মাত্র আড়াইশো গ্রাম কিনতাম, তা উঠতে উঠতে কুড়ি টাকায়—তা পাঁচ টাকা খরচ করার সাধ্য কি আছে? এমাসে ওটা বাদ দিয়ে দিলাম। আমার সারা জীবনের অভ্যাস—। তার ভাবতে অবাক লাগে সেকশনের প্রত্যেকে কেন তাকেই দুঃখের কথা শোনায়। সেতো একজন সামান্য মানুষ। গরম লেকচার টেকচারও দেয়না কথায় কথায়। বস্তুতঃ সে ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে কথাও বলতে পারেনা। তবে? সতীশবাবু তাকে চুপিচুপি বলেন, দেখনা ভাই উদার মনের কোন বালাই নেই তোর? ব্রাহ্মণের ছেলে? আমার মেয়েটা খুব লক্ষ্মীমন্ত। মাঝে মাঝে মেয়েটার ওপরেও রাগ হয় জানিস্! কখনও কখনও মাথা ঝাঁকিয়ে সতীশবাবু রাগের কথা বলেন। বলেন, যদি একটা প্রেমট্রেম করেও নিজের ব্যবস্থা করে নিতো তাহলে আমি তাকে বুক ভরে আশীর্বাদ করতাম। কিন্তু মেয়েটা বড় লক্ষ্মী কিনা তাই দুর্গামের ভাগী হবেনা—আঃ দুর্গাম—দুর্গাম। লোকের কথায় কি আসে যায়? লোককি আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে? এই সতীশবাবু তাঁর সাহেবের ঘরে গিয়ে কি বলবেন? প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নেই। তবে সতীশবাবুর এ রকম বদনাম আছে যে, তিনি নাকি সেকশনের কথাবার্তা সাহেবের কানে তুলে থাকেন। কিন্তু পরিবর্তে তিনি কি পান? তা অন্ততঃ অবিনাশবাবুর মতো এরকম বাজে কথাটথা শুনতে হয়না—এটুকুই লাভ কি? সতীশবাবু আর অবিনাশবাবু দুজনেই তো এখানে প্রায় পঁচিশ বছর দোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হয়েই কাটিয়ে দিলেন, তাদের সামান্যতম প্রমোশনটুকুও হয়নি। হঠাৎ অবিনাশবাবুর ছেলের কথা তার মনে হলো, সে আজ পনেরো দিন হলো হাসপাতালে আছে। তার পেটে আলসার হয়েছে—অজস্র রক্তক্ষরণ। অনেক রক্ত দিতে হয়েছে তাকে। দুদিন একটু ভালোর দিকে ছিল। কিন্তু গতকাল অবিনাশবাবু অফিসে আসেননি। তবে কি আবার—সে জিজ্ঞাসা করল, অবিনাশবাবু, আপনার ছেলে কেমন আছে? অবিনাশবাবু কপালে আঙুল ঠুকলেন। বললেন, ভালো না। আবার গতকাল রক্ত দিতে হয়েছে। আবারো হয়ত দিতে হবে। কিন্তু আমি একেবারে নিঃসম্বল হয়ে গেছি। সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

রক্ত—আরো রক্ত—মানে আরো টাকা—সন্তান—স্নেহের সন্তান—তার সুস্থতায় অন্ধ বাবের সামর্থ কতটুকু? এইটুকু? মায়ের ইচ্ছা আমার বিবাহ।

খুব সদিচ্ছা, এবং আমার রক্তের মধ্যে মাঝে মাঝে পদধ্বনি বেজে ওঠে। রক্তে জোয়ার আসে, কি যেন আকুলতা···আমার স্ত্রী-সন্তান এবং সংসার—কিন্তু তাদের সুখ? তাদের ভবিষ্যৎ? আর আমার দু' বোন, তাদের বিয়ে আমাকে দিতে হবে। আজ না হয় কয়েক বছর পরে. তাদের বিবাহ—তাদের সুখ—কিন্তু টাকা? আমার সামর্থ? নাকি সতীশবাবু যে কথাটা মেয়েকে বলতে পারেন নি সেকথা আমি বোনেদের বলে দেব? তার মাথার মধ্যে ধপ্ ধপ্ করছিল, সমস্ত শরীরে উত্তাপ, সে উঠল। বেসিনে গিয়ে চোখে মুখে ভাল করে জল দিলো। অবিনাশবাবুর এই ব্যাপারটার একটা সম্মানজনক ফয়সালা হওয়া দরকার। হয়তো তাঁর ছেলের অসুস্থতার জন্য তাঁর মন বিক্ষিপ্ত —খুবই স্বাভাবিক এবং তার জন্য তাঁর ফাইলে কিছু ভুলভ্রান্তি হ'য়ে থাকতে পারে। আর একথা উনি জানেন না তাও নয়। অবিনাশবাবু কয়েকদিন এলোমেলো ছুটি নিয়েছেন, কোন কোন দিন অফিস থেকে ছুটির অনেক আগেই চলে গেছেন এবং ওনাকে বলেই গেছেন। অথচ সবকিছু জানা সত্ত্বেও এই বিশ্রী ব্যবহার—এই অপমানকর কথাবার্তা, এর একটা বিহিত না হ'লে ওনার উগ্রতা আরও বাড়বে। যা খুশী তাই বলার সাহস বাড়বে, সে মনস্থির করে ফেলল, ব্যাপারটা গুছিয়ে লিখে ওপর মহলে একটা আপীল করতে হবে, এবং তার জন্য চাই অবিনাশবাবুর মনের দৃঢ়তা। কারণ আপীলটা তিনিই করবেন। সে অবিনাশবাবুকে ডাকল। বলল, অবিনাশবাবু, ছুটির পর আমরা একসঙ্গে হাওড়া পর্যন্ত যাবো, আপনি আপনার ট্রেনে উঠবেন আমি আমার বাসে।

সতীশবাবু টিফিন খাচ্ছিলেন। তাঁর চোয়ালের হাড় দুটো ওঠানামা করছে। মাঝে মাঝে দাঁতে জড়ানো রুটি জিভ দিয়ে চুষে নিচ্ছেন। এবংবিধ ক্রিয়া কলাপ সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। নানান মানুষ নানান ভঙ্গীতে খাওয়া দাওয়া করে। কিন্তু এই খাওয়া কাজটারও লীল অশ্লীলতা আছে—কথাটা হঠাৎ তার মনে হলো। সতীশবাবুর খাওয়ার ভঙ্গীটা তার বড় অশ্লীল লাগছিল। কেমন যেন জান্তব ভাব। খাওয়া-ইট ইজ এ্যান এসেনশিয়াল পার্ট অফ্ লাইফ্। এই অংশটিকে যদি জীবন থেকে বাদ দেওয়া যেত। অথচ খাওয়াই জীবন! সতীশবাবু আপনি একটু শোভনীয় ভাবে, সে প্রায় বলে ফেলেছিল আর কি। কি অন্যায় - সে উঠে এসে সতীশবাবুর সামনের চেয়ারে বসল। বলল, সাহেব আপনাকে কি বললেন? সতীশবাবু কেমন যেন থতমত খেয়ে তাকালেন। মিউমিউ করে বললেন, তোকে মিথ্যে বলব না, জিজ্ঞাসা করছিলেন তুই কোন

পার্টির মেম্বার। তা আমি বললাম, ওতো পার্টি-ফার্টি করে না। তুই আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস। তবে তুই যেন আবার এই নিয়ে তর্ক করিস না, তাহলে আমার অবস্থা—একটা ঢোক গিললেন সতীশবাবু। বেয়ারা এসে দাঁড়াল। বলল, আপনাকে সাহেব ডাকছেন।

আবার ছায়াছায়া ঘর—টেবিল ল্যাম্প—আলোয় ভাসা টেবিল—আলোর সীমানার ওপারে মুখ—

—হ্যাঁ গত সপ্তাহে হরতালের দিন আপনি আসেন নি, ওপর থেকে আপনার ছুটির দরখাস্তের ওপর একটা নোট দিতে বলেছে।

—আমি তো লিখেছি কেন আসতে পারিনি।

—পড়েছি—অসুস্থতা।

—হ্যাঁ। আমার ক্রনিক এ্যাসিডারোসিস্ আছে, মাঝে মাঝে ওটা ট্রাবল দেয়।

—দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা হরতালের দিনই হ'লো। যাই হোক মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেননি কেন?

—মেডিক্যাল সার্টিফিকেট? সে যেন ব্যঙ্গ করে হাসল, অত অল্প অসুখে আমাদের ডাক্তারের কাছে যাবার পয়সা নেই। নিজেই দরকার মতো দু' চারটে ট্যাবলেট কিনে আনি—সেরে যায়।

—না, ওটা থাকলে আমি ব্যামেলা এড়াতে পারতাম।

—আপনি যা খুশী লিখতে পারেন।

—আপনি কী কোনো পার্টির সঙ্গে জড়িত?

—আপনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে চলে যাচ্ছেন।

—আমি বলতে চাইছি আপনার হরতালে সমর্থন ছিল এবং সেজন্যই অফিসে আসেন নি।

—ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে বলতে পারি—হ্যাঁ। কারণ, হরতাল ডাকা হয়েছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে। মাইনের টাকায় আমার পরিবারের সকলের কোন রকম খাওয়া দাওয়া জোটান আমার সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি আমার অনুপস্থিতির কারণ লিখেই জানিয়েছি।

—আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

রক্ত বড় দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছিল ধমনীতে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ শব্দ। মাঝে মাঝে কি যেন হয়। কোথা হ'তে যেন চৈত্রের মধ্য দুপুরের তপ্ত

বাতাস ছুটে আসে। শরীরে জ্বালা ধরে যায় রক্ত ঘামিয়ে বেড়ায় শিরায় শিরায়।

সে ভাবছিল, আমি পৃথিবীর এক অসুস্থ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি এক অসুস্থ সময়ের গর্ভে লালিত হচ্ছি, আমার বড় অসুখ।

দূর পাল্লার কোন ট্রেনে সে কখনও ওঠেনি। সত্যি কথা বলতে কি তার এই তিরিশ বছর বয়সের জীবনে খুব মনে করে দেখলে সে তিন চার বারের বেশী ট্রেনে ওঠার কথা মনে আনতে পারে না, তাও লোকাল ট্রেন। হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি শহরতলীর যেখানে সে থাকে সেখান থেকে তার সীমাবদ্ধ জীবনের কাজের গণ্ডিগুলি বাস-ট্রামের আওতায় পড়ে। তার মনে পড়ে ছোট বেলায় প্রথম সে ট্রেনে চেপেছিল পুটু মালীর বিয়ের সময়, বরযাত্রীদের সাথে। সে দিনের উত্তেজনার কথা আজও মনে করলে সে অনুভব করতে পারে। তখন বোধহয় সে ক্লাস ফাইভে-টাইভে পড়ে, বাবার হাত ধরে আরও অনেক সাজ গোজ করা স্কুলবাবু মানুষদের সাথে সে এই হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠেছিল। তখনও ইলেকট্রিক্ ট্রেন হয় নি। স্টীম ইঞ্জিনের ধোঁয়া—হস্ হস্ শব্দ প্লাটফরমের শেডে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত·· এই সব ভাবতে ভাবতে সে হাওড়া স্টেশনের বিশাল শেডের নীচে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়েছিল। অবিনাশবাবুকে নিয়ে ট্রেনটা চলে গেছে। হাজার হাজার ব্যস্ত মানুষের আনাগোনার মাঝে সে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। কিছুটা বা এলোমেলো। এদিক ওদিক চাইছিল অথচ কিছুই যেন দেখছিল না। তাকে খুব ক্লান্ত বিষণ্ণ এবং ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল। কখনও কখনও সে এই বিশাল রেলস্টেশনে বেড়াতে আসে। এক একদিন কি যেন হয়। মন জুড়ে এক গভীর বেদনাবোধ সারাক্ষণ উথলে ওঠে। এক বিশাল শূন্যতা চারপাশ থেকে ঘিরে আসে। কোথায় যেন পালাতে ইচ্ছা হয়···। তখন সে এখানে এসে দাঁড়ায়। যেন কোনো বিশাল বিস্ময়কর প্রাণবন্ত জগতের দুয়ারের চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চায়। কি যেন দেখতে চায়····। ঘোষকের কণ্ঠস্বর গমগম করে—আহ্বানে—ব্যস্ত মানুষদের ছুটোছুটি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি। মনে হয় কি যেন ঐশ্বর্য পাওয়া একরাশ মানুষ। প্লাটফরম জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ট্রেন কেমন গম্ভীর। সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলে কোন সুদূরের সঙ্কেত জলজল করে

ওঠে। সে বড় তৃপ্তি পায়। আস্তে আস্তে মনটা ভালো হ'য়ে ওঠে। কেন তা সে জানে না। কিন্তু এরকম হয়।

এমনিতে সে বেশ শক্ত মনের মানুষ। তিনশ টাকা মাইনের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী সে। নিজের সামর্থ সংগতি এবং মান সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বিধবা মা চার ভাইবোন এবং সে এই ছ'জনের পরিবারে মাথা পিছু মাসে পঞ্চাশ টাকা—তাইতে খাওয়া দাওয়া পোষাকআসাক চিকিৎসা লেখাপড়া লোক-লৌকিকতা। তবু বাবা মাথা গোঁজবার মতো বাসস্থান দিয়ে গেছেন। তাকে খুব হিসাব করে চলতে হয়। সে জানে এর বেশী কোন দিনই এগোতে পারবে না সে। তাই তার দৈনন্দিন জীবন খুবই সাদামাটা মন্থর গতিতে চলে। ঠেলে গুঁজে ঠোক্কর খেতে খেতে মাথা নীচু করে। কিন্তু তবু—তবু মাঝে মাঝে এমন এক একটা ঘটনা সামনে এসে দাঁড়ায়—সব এলোমেলো হ'য়ে যায়। কে যেন তাকে এক যাদুকরের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে, দেখ তুমি কত হীন, কত ছোট। তখন চৈত্রের মধ্য দুপুরের উত্তপ্ত বাতাস ছুটে আসে যেন। সারা শরীরে আগুনের হলকা ছড়ায়। তখন মনের মধ্যে পাথুরে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ধাক্কা দেয় বুকের মধ্যে ··তারপর এক সময় শান্ত হ'য়ে এলে রক্তের আন্দোলন গভীর বেদনা মনের মধ্যে উথলে ওঠে। এক গভীর শূন্যতা চারিদিক থেকে ঘিরে আসে অন্ধকার প্রান্তরের মতো···।

তীব্র হুইসল্ দিয়ে একটা ট্রেন ঢুকছিল প্লাটফরমে। অন্যমনস্ক সে চমকে উঠল। ঘড়ি দেখল—ছটা বাজে—দুটো থেকে ছটা—কয় ঘণ্টা? সে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলো। চার ঘণ্টা—সে নিজেই উত্তর দিল। মাত্র চার ঘণ্টায় রক্ত কত শান্ত হ'য়ে এসেছে। সে মনে মনে বলল। আমার রক্ত বড় কমজোরী ভাবতে ভাবতে সে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ দুপুরে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে। চারিদিকে প্যাচপেচে জলকাদা। গিসগিস লোকজন। বিশৃঙ্খল এক মিছিল যেন। কাতারে কাতারে মানুষ যাচ্ছে আসছে। আসছে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে মানুষ জন্মাচ্ছে—ধুঁকছে-মরছে-জন্মাচ্ছে। সে দাঁড়াল। চুপচাপ আনমনা দাঁড়িয়ে ছিল সে। বিশৃঙ্খল মিছিল দেখছিল।

অথচ, জনতা অনেক কিছুই পারে। ধ্বংস করতে পারে। সৃষ্টি করতে পারে। অথচ জনতা আশ্চর্য উদাসীন। তারা প্রত্যহ কাঁদছে। সারাক্ষণ কাঁদছে। ট্রামে বাসে অফিসে ঘরে কান পাতলে শোনা যায় জনতা ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদছে। কেবলি কাঁদছে ভিড়ে ভিড়ে ধাক্কাধাক্কি করছে আর চিৎকার

করে কাঁদছে। আলোচনা করছে, সমালোচনা করছে। নেই নেই অভাব অভাব-এক বিশ্রী কান্না-কাঁদছে আর সকলকে উৎসবে পাঠাচ্ছে। সহসা একটা কথা তার মনে হ'লো—বাঙালী কাঁদে এবং উৎসবে যায়। কথাটা সে মনে মনে আওড়াল—কোথায় যেন পড়েছে? কে লিখেছেন? ও হ্যাঁ, সে এক মন্বন্তরের গল্প। সেই বঙ্কিম কটাক্ষকারী ব্যক্তিটির ছবি মনে পড়ল তার। সে প্রায় দুশো বছর আগেকার কথা—তখন বোধহয় মীরজাফর বাংলার নবাব। নামে মাত্র নবাব। তাহলে কি সেই ট্রাডিশন সমানে চলছে?

সে ভাবছিল, আর চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আর জনতা দেখছিল। প্যাচপেচে কাদা রাস্তা দেখছিল। মাঝে মাঝে আইল্যাণ্ড—ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বর্গাকার আইল্যাণ্ড ল্যাম্পপোষ্ট বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। ল্যাম্পপোষ্টের নিচে সারি সারি ইটের উনুনে আগুন জ্বলছিল। রান্না, মানুষ জনতা! সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল ওদের। না, এদের কাউকে আলাদা করে চেনা যায় না। মনে হচ্ছে কারো মুখের কোন বিশিষ্ট আদল নেই। প্রায় নগ্ন সারিবদ্ধ মানুষ। হ্যাঁ আশ্চর্য সারিবদ্ধ। আর শিশুরা। শিশু? ভবিষ্যৎ? দেশের? জাতির? এরা কার ভবিষ্যৎ? সহসা সে চমকে উঠল। ওই শীর্ণ বৌটি আর তিনটে ছেলে মেয়ে ওগুলো কি বাছাবাছি করছে? কাছাকাছি একটা মাছের পাইকারী বাজার আছে—সেখান থেকে কি ওগুলো কুড়িয়ে এনেছে ওরা? মাছ কতটা পচলে তবে ফেলে দেওয়া হয়? মাছের বাজার থেকে কুড়িয়ে আনা কুড়ি ভেঙে ভেঙে জ্বাল দিচ্ছিল। আর মাছ পোড়াচ্ছিল। একটা বীভৎস গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল যেন। চারপাশ দিয়ে অনায়াসে হেঁটে চলে যাচ্ছে বিশৃঙ্খল জনতার মিছিল ...যাচ্ছে আসছে.. আসছে যাচ্ছে...অনায়াসে....আমি এক দুঃস্থ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছি...আমি এক অসুস্থ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছি...তেরশো পঞ্চাশ সালে আমার জন্ম। সেটা নাকি দুর্ভিক্ষের বছর। সেই দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ লোক নাকি মারা গিয়েছিল।

বাবার কাছে সে গল্প শুনেছিল প্রত্যহ সকালে কাতারে কাতারে মৃতদেহ পড়ে থাকত রাস্তায়—না খেতে পাওয়া মৃত মানুষ—হাজার হাজার। সাফ্ করে ফেলা হোত রোজ। অথচ সে দুর্ভিক্ষ নাকি মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই জনতা নীরবে মরে গেল। দয়া চাইতে চাইতে, করুণা চাইতে চাইতে সেই জনতা নীরবে মরে গেল। উন্মত্ত হল না? ধ্বংস করল না?—

আমি এক অসুস্থ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছি · আমি এক অসুস্থ সময়ের গর্ভে পালিত হচ্ছি···

পোড়া মাছগুলি ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে কেমন নিশ্চিন্তে খাচ্ছে ওরা। আঃ! সে মুখ ফিরিয়ে নিল। সামনে একটা পত্রিকার স্টল। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক টুক করে কি যেন একটা বই ব্যাগে পুরে ফেললেন, তারপর মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করলেন। সে দোকানের বইগুলি দেখছিল। সারি সারি সাজান উত্তেজক ফটো অজস্র যৌনপত্রিকা দুলছিল।

এক বীভৎস গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে যেন। তার শরীর কেমন জ্বর জ্বর লাগছিল। জিভটা শুকনো। তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খেলে হতো। সে বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে পথ হাঁটছিল। ক্লান্ত বিধ্বস্ত। একটা উপচে পড়া ভীড় বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল।

ঝুলতে ঝুলতে একসময়ে সে কেমন করে একধাপ ওপরে চলে এলো। ভাদ্রমাসের গুমোট। চাপচাপ লোকজন। ঘামের গন্ধ। এমনিতেই তার মাথা ভারী হয়েছিল। এখন কপালের পাশে দু'একটি শিরা যেন ছিঁড়ে ফুড়ে যেতে চাইছিল। লেডিস্ সীটের সামনে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের নরম পেটের অনেকাংশ দেখা যাচ্ছিল, এবং উদ্ধত বুকের পাশ। মাঝে মাঝে শাড়ী যেন উড়ে যাচ্ছিল, নাভিপ্রদেশ উন্মুক্ত হচ্ছিল। তাদের গায়ের ওপর কয়েকজন লেপটে ছিল। মেয়ে দুটি দুএকবার ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ কপাল কুঁচকে শাসন করতে চাইল নাকি? সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। অথচ ওদের শাড়ী বারবার যেন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তরে এদিক ওদিক সরে যাচ্ছিল নাভিপ্রদেশ এবং উন্নত বুকের পাশ উন্মুক্ত করছিল এবং যেন এক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তারা শাড়ি টেনে ঢাকা দিচ্ছিল। আবার সরে যাচ্ছে আবার শাড়ি টানা ইত্যাদি দেখতে দেখতে তার কেমন হাসি আসছিল। লেপটে পড়া লোকগুলি এবং তাদের পেছনে আরও যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও লোভীর মতো আঃ কে যেন তার পা মাড়িয়ে দিলো। শুয়োরের বাচ্চা। সে মনে মনে বলল। কাকে বলল? কণ্ডাক্টর তার নাকের কাছে ফর্ ফর্ করে টিকিটের বাণ্ডিলটা বাজিয়ে দিয়ে বলল টিকিট টিকিট।

অফিসে আসতে তার একটু দেরী হয়ে গেল। দেরীতে অফিসে আসায় সে অভ্যস্ত নয়। তার নিজের এটা ভাল লাগেনা। কিন্তু আজ রেশন আনতে

হয়েছে তবে আজ ভাত হয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু চাল তাকে বাজার থেকে কিনতে হয়, রেশনের চালে ঘুলোয় না। কিন্তু মাসের শেষে তার পকেটে টাকা এতো তলানিতে এসে পৌঁছেছে যে চাল কিনতে গেলে রেশন তোলা যাবেনা।

টেবিলে এসে সে অবিনাশ বাবুকে ডাকল। পকেট থেকে আপীলের খসড়াটা বার করল। কাল রাত্রে অনেক কাটাকুটি করে বেশ কড়া ভাষায় সে এটা লিখেছে। অবিনাশবাবু কাছে এসে দাঁড়ালে সে কাগজটি তার হাতে তুলে দিল। বলল, এটা টাইপ করে সই করে দিয়ে আসুন। অবিনাশবাবু চুপচাপ তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর কিছুটা সঙ্কুচিত ভাবে বললেন, ওটা আর দরকার হবেনা।

—কেন ?

—আমি সাহেবের ঘরে গিয়েছিলাম, একটা মিটমাট হ'য়ে গেছে।

—মানে। উনি আপনাকে ডেকে ক্ষমা চেয়েছেন ?

—না, ঠিক তা নয়। তবে কি জানেন আমরা সামান্য মানুষ কি হবে ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে। শেষে একটা কিছু—ঢোক গিললেন অবিনাশবাবু—তাই আমি ওনার কাছে গিয়েছিলাম। বললাম, জানেন তো, ছেলেটার অসুখ, আমার মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তা। তাই ভুল কিছু হ'য়ে গেছে। উনি বললেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি আসুন—

তার মাথার মধ্যে রক্ত লাফিয়ে উঠল। তড়িৎ প্রবাহে সমস্ত শরীর টানটান হ'য়ে গেল যেন। সে হাত তুলল, প্রচণ্ড জোরে এক ঘুষি মারল অবিনাশবাবুর চোয়ালে। অবিনাশবাবু কি যেন বলতে চাইলেন, তাঁর হলদে ম্লান চোখ বিস্ফারিত হলো, তিনি টেবিলের কোণ আঁকড়ে কোনক্রমে নিজেকে খাড়া করিয়ে রাখলেন। তাঁর কষ বেয়ে রক্তের দাগ নামল।

সে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো। তারপর দ্রুত হাঁটতে থাকল। কোথায় যাচ্ছিল সে জানে না। সে পথ হাঁটছিল।...আমি জানি—অবিনাশবাবু আমি জানি এ আপীলের খুব একটা মূল্য নেই—সে যেন অবিনাশবাবুকে সামনে রেখে তর্ক করছিল—আমি জানি আপনার এই আপীল আজকের এই দুঃস্থ সময়কে এতটুকু টলাতে পারবে না। যারা শোষক তারা থাকে অনেক দূরে আমাদের নাগালের বাইরে। তারা কিছু কিছু সুখ সুবিধা আর স্বচ্ছলতা দিয়ে নিয়োগ করে রেখেছে এইসব দায়রক্ষী বক্ষ। এই রক্ষেরা

আমাদের শাসন করবে দাবিয়ে রাখবে যাতে আমরা মাথা তুলতে না পারি। আপনার এই আপীল সে ব্যবস্থাকে এতটুকু কাঁপাতে পারবে না। কিন্তু আর কিছু না হোক আত্মমর্যাদাটুকু তো আমরা বাঁচাতে পারি? সেটুকুও আপনি বিসর্জন দিলেন?

মোটামুটি প্রকৃতিস্থ হলে সে দেখল, সে হাওড়া ব্রীজের কাছে দাঁড়িয়ে। হাঁটতে হাঁটতে সে অনেকটা চলে এসেছে। ব্রীজের মাঝামাঝি এসে সে রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়াল। সামনে আকাশ, মুক্ত নীল আকাশ, নীচের দিকে তাকালে জলস্রোত দেখল সে। দূরে যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি বিস্তারিত করল। শরতের ভরা নদী। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দু'একটি নৌকা, বোট, স্টীমার। সারাক্ষণ একটা ঝম্‌ঝম্ শব্দ বাজছিল কানের দুপাশে। ঘাড় ফিরিয়ে একপলক অজস্র যানবাহন দেখলো সে। তারপর নীচে জলস্রোতে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তার বুকের মধ্যে একটা কান্না ঠেলে উঠছিল। গলার কাছে দলাপাকানো যেন একটা ভারী পাথর। তার চোখের কোল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। হাত দিয়ে চোখ মুছল সে, তারপর ক্লান্ত পদক্ষেপে বাড়ীর দিকে হাঁটতে থাকল।

সারাটা দিন সে কাটাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো। সারাটা দিন সে কাটাল পথে পথে। সন্ধ্যায় সে যখন ঘরে ফিরল তখন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে ঘরে এলো। সারা শরীরে উত্তাপ, আর মাথার মধ্যে ঝিঝিবিঝি শব্দসম্ভুল অরণ্য যেন। ভিজে জামা কাপড়ে সে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে রইল। এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে সে যেন নিক্ষিপ্ত এইরকম একটা ভাব তার মনের মধ্যে নড়াচড়া করছিল। এরপর কি? এরপর? এরপর আমার চাকরি নিশ্চয়ই থাকবে না। এরকম একটা সুযোগ তারা নিশ্চয়ই হাতছাড়া করবে না। তারপর? আমি? আমার সংসার? সে ভালভাবে গুছিয়ে কিছুই ভাবতে পারছিল না। তার চোখের ওপর শীর্ণকায় ভিক্ষুকেরা চলাফেরা করছিল। আমি ভিক্ষুক হয়ে গেলাম, সে বিড়বিড় করে বলল—হে ঈশ্বর আমি একেবারে ভিক্ষুক হ'য়ে গেলাম····।

ট্রেন ছুটছিল। সে জানালার ধারে বসেছিল। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল তারে তারে, সট্ সট্ করে ছুটে চলে যাচ্ছিল পোস্টগুলি। সবুজ বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের স্তূপগুলি আপন মনে যেন

ঘুমুচ্ছিল আর ঘুমুচ্ছিল। হু হু করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাতাস। খুব ভাল লাগছিল তার। খুব সকালে সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে। হাওড়া স্টেশন। আর এখন হলদে আর নীল রঙের ইলেকট্রিক ট্রেন যেন পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে।

সকালের সূর্য একটু ওপরে উঠেছে। একটা স্টেশনে গাড়ী থামল। একটা ছেলে চা বিক্রি করছিল। সে হাত নেড়ে ডাকল, চা আর বিস্কুট নিল। চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ আরাম বোধ করল। সে অবিনাশবাবুর বাড়ী যাচ্ছিল। আজ রবিবার। তিনদিন সে বাড়ী থেকে কোথাও বেরোয়নি। তিনদিন তিনরাত সে ভাল করে খায়নি, ঘুমায়নি। সারাক্ষণ তার বুকে কীযেন এক ব্যথা মোচড় দিয়েছে আর দুটি হলদে বিবর্ণ চোখ—আঃ—সারাক্ষণ তার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে, তাকে জর্জরিত করেছে, ক্লান্ত করেছে। আর সেই গভীর অন্ধকার গহ্বর—হে ঈশ্বর, আমি একেবারে ভিক্ষুক হ'য়ে গেলাম।

আজ খুব ভোরে উঠে সে স্নান করল। তিনদিনের গভীর ক্লান্তি ধুয়ে ফেলতে চাইল যেন, তারপর চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল। এখন সে অনেক শান্ত, শরীরে সত্যই যেন কোন ক্লান্তি নেই। সে ঘুরে বহুদূরে নীল আকাশ সাদা মেঘ আর সবুজ ধানক্ষেতের সীমারেখায় দৃষ্টি ভাসিয়ে দিল।

তারপর পলেস্তারা খসা এক জীর্ণ বাড়ী। গাছ গাছালি, ঝোপঝাড়, একটা বাচ্চা ছেলে তাকে বাড়ীটি চিনিয়ে দিল। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় সে ডাকল—অবিনাশবাবু—

হলদে বিবর্ণ চোখ, আলগা গায়ে অবিনাশবাবুকে আরও শীর্ণ লাগছিল, পাঁজরের হাড়গুলি গোনা যায়—সে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর নীচু হ'য়ে তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। অবিনাশবাবু ভয়ে ঢুলা পিছিয়ে গেলেন। সে বলল, অবিনাশবাবু আমাকে আপনার পায়ে হাত রাখতে দিন। তার কণ্ঠস্বরে আকুলতা ঝরে পড়ল।

—কিন্তু, আমাকে প্রণাম নিতে নেই—আমার অশৌচ—

সে চমকে উঠল।

—গতকাল আমার ছেলে মারা গেছে—আবার রক্তক্ষরণ—

আর হ্যাঁ—ওরা আপনার জন্য ডিসমিসাল চার্জশীট তৈরী করেছিল—আর আমাকে সাক্ষী—আমি বলেছি, আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম, টেবিলের কোণা লেগে—

কে যেন কাঁদছিল। জীর্ণ দেওয়ালগুলির ফাঁক দিয়ে কান্না চুইয়ে পড়ছিল যেন। বড় অসুস্থ সময়···আমি এক অসুস্থ সময়ে···সে ভাবছিল·· আমি লালিত পালিত হচ্ছি অসুস্থ সময়ের গর্ভে···আমার বড় অসুখ···

সমরেশ মজুমদার

নিজের মুখ

এতক্ষণ ছিল দুধারে চাপ জঙ্গল আর তার নিঃশ্বাসের মত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, জিপের পেছনে রাখা বিয়ারের বোতলগুলোর ঠুনঠুন শব্দ, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ইঞ্জিনের গোঙানি। সেই কেরন ফরেষ্ট রেঞ্জারের অফিস থেকেই এটা শুরু হয়েছিল। আর এখন হঠাৎ, একদম আচমকিতে ওরা এসে পড়ল একটা খোলামেলা জায়গায়, যেখানটায় জঙ্গল নেই, উঁচু ঢিপির মত একটা টিলার পাশ ঘেঁষে কাঁচা রাস্তাটা উপুড় হয়েছে ছোট খাদের গর্ভে। তার ওপরে একটা কাঠের সাঁকো ; সাঁকো পেরিয়ে ছবির মত কাঠের বাংলো। চাপড়ামারি ফরেষ্ট বাংলো।

টিলাটা কাছে আসতেই স্পীড্ কমিয়ে ছিল অরুণ, খাদটার কাছে এসে ইঞ্জিন বন্ধ করতেই লাফিয়ে নামল ওরা। কি চুপচাপ, ভীষণ চুপচাপ জায়গা এটা। অন্তত মাইল দশেকের মধ্যে কোন বাড়ি-ঘর নেই। জলঢাকা প্রজেক্টে চলে গেছে যে রাস্তাটা বাঁদিকে হয়ে সেটাও প্রায় মাইল তিনেক দূরে। চার-পাশে জঙ্গল, মাঝে প্রায় একশ গজের চৌহদ্দিতে পরিষ্কার জায়গায় বাংলোটা দাঁড়িয়ে। নিচে মাটি কেটে একটা চৌকোনো পুকুরে টুপটাপ মাছ খেলছে। ওরা তিনজনে দম বন্ধ করে জায়গাটা দেখল। কেমন ভয় ভয় লাগে। শেষপর্যন্ত পরিতোষ বলে উঠল, 'দারুণ জায়গা মাইরি, প্রেম করতে ইচ্ছে করে।'

'এখানে প্রেম। ইম্পসিব্‌ল, ভয়েই মরে যাবে।' কাঁধ ঝাঁকালো হরিদাস।

'তুই শালা একদম বেরসিক।' পরিতোষ এগিয়ে গিয়ে টিলাটার পাশে দাঁড়াল, আচ্ছা ভাবতো, ঐ পুকুরটার ধারে একটা লাল নীল ছাতার তলায় তুই সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে আছিস, একটা জাঙ্গিয়া আর গগ্‌লস্ তোর শরীরে, পাশে একটা বিয়ারের বোতল। আর তোর সামনে দারুণ একটা মেয়ে স্নেক্

বিকিনি পরে সাঁতার কাটছে, যার চুলগুলো না-কালো না-লাল হয়ে ঝেঁপে-ফুঁপে কাঁধ ছুঁয়েছে—ওঃ, মাইরি মরে যাব।'

অরুণ অন্যমনস্ক হয়ে চারধার দেখছিল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কাঠের সাঁকো পেরিয়ে বাংলোর বাগানে ঢুকলো। এই বাংলোর বিট্ অফিসার ওর চেনা। দু' তিনবার কুপ ভাকার আগে এই ফরেস্টে ও গাছ দেখতে এসেছে। আর তাছাড়া স্বয়ং রেঞ্জার কৃতার্থ হয়ে অনুমতি দিয়েছে থাকার, অসুবিধার প্রশ্নই ওঠে না। বেশী দূর যেতে হল না, অরুণ দেখল বিট্ অফিসার আসছে। অরুণকে দেখে হেসে কপালে আঙুল ছোঁয়ালো। জিপের আওয়াজ আগেই পেয়েছিল।

'আমরা এলাম, আজ রাত্রে থাকবো।' অরুণ বলল।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কি সৌভাগ্য। আজকাল তো আপনাকে দেখতেই পাই না।' লোকটা বিগলিত হল।

অরুণের মনে পড়ল এর আগের বার এই রেঞ্জেই ও কাঠ কাটার অর্ডারটা পেয়েছিল। তখন এই লোকটাকে একশটা টাকা দিতে হয়েছে। কুপটা ভাকার পর ধরা পড়েছিল, যে টাকার বিনিময়ে যে গাছগুলো ও পেলো তাতে লাভ বেশী থাকে না। সুতরাং আশে-পাশের কিছু গাছ বে-আইনীভাবে দরকার হয়ে পড়ায় লোকটা রাজী হয়েছিল।

'গাড়িটা ভেতরে নিয়ে আসুন স্যার। বাইরে রাখবেন না।'

'কেন?' অরুণ জিজ্ঞাসা করল।

'আর বলবেন না, প্রচুর হাতি এসে গেছে এসব জঙ্গলে। কিভাবে যে বেঁচে আছি বুঝবেন না স্যার।' রীতিমত উদ্বেগ চোখে মুখে ছড়িয়ে বলল বিট্ অফিসার। কথা বলতে বলতে ওরা সাঁকোটার কাছে এগিয়ে এল। পরিতোষরা কাছেই ছিল। বিট্ অফিসার বলল, 'পুরো বাংলোটা প্রায় দশ ফুট খাদ দিয়ে ঘেরা, তবু ব্যাটাদের হাত থেকে নিস্তার নেই।'

অরুণ সাঁকোটা দেখিয়ে বলল, 'এটার ওপর দিয়েই তো আসতে পারে।' ঘাড় নাড়লো বিট্ অফিসার, 'না না, এর কাঠগুলো নুজ, আমরা খুলে রাখি। হাতিগুলো দারুণ ধড়িবাজ। যদি না পেরোতে পারে একটা নেমে যায় খাদে। আর তার পিঠের ওপর পা রেখে বাকিগুলো এপারে চলে আসে। ফেরার সময় সবাই মিলে শুঁড় দিয়ে খাদেরটাকে তুলে নিয়ে যায়।'

অরুণ জিপটাকে সন্তর্পণে নড়বড়ে সাঁকোটার ওপর দিয়ে ভেতরে নিয়ে

এল। পরিতোষ হাত দেখিয়ে বলল, 'আমি এদিকে আগে আসিনি, অস্ত্র-শস্ত্র কি আছে?'

'সব আছে। তবে কেউ কেউ বেরোয়, কেউ কেউ বেরোয় না। ঐ যে সামনে পুকুরটা দেখছেন, সন্ধ্যে হলেই দেখবেন পাল পাল হাতি এসে স্নান করছে ওটাতে। হাতির জন্যে করা হয়েছে ওটা।' বিট্ অফিসার কথাটা শেষ করতেই হরিদাস হো হো করে হেসে উঠল। জঙ্গলে জঙ্গলে হাসিটা কেমন অদ্ভুত শোনাল।

অরুণ বলল, 'হাসছিস যে!'

'একটু আগে পরিতোষ বিকিনি পরা মেয়ের সাঁতারের স্বপ্ন দেখছিল কিনা তাই।'

'খাওয়া দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবেন?' অরুণ জিজ্ঞাসা করল।

'সে সব ভাবনা আমার ওপর ছেড়ে দিন। সকালে দুটো মুরগী হঠাৎ চলে এসেছিল এদিকে। মেরে ফেললাম। একটা ছর্যাতেই দুটো পড়ল। ভাত খাবেন না রুটি?' বিট্ অফিসার দাঁত বার করল।

'খেতে কি পারব।' অরুণ উঠে দাঁড়াল।

'দারুণ দারুণ. মাইরি কি লাক্ করেই না জন্মেছি। বনে এসে বনমুরগী। ভাত নয়, রুটি করতে বলুন।' পরিতোষ উৎসাহে সিগারেট ধরালো। অরুণ কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল ভিনটে বিয়ারের বোতল ঝুলিয়ে। সেই ভজন বিয়ার আর একটা ব্লাক নাইট, আদর করে বলে বি. কে., কিনে এনেছে বানারহাট থেকে। পথে অবশ্য দুটো বিয়ার অরুণের পেটে গেছে। ওরা খায় নি। এখন বিয়ার দেখে নড়ে চড়ে বসল সবাই। বিট্ অফিসারের দিকে তাকিয়ে অরুণ বলল, 'চলে নাকি?'

মাথা দুলিয়ে হাসলো লোকটা।

'যান, একটা গেলাস নিয়ে আসুন গিয়ে।' অরুণ টেবিলের ওপর বিয়ারের বোতলগুলো রাখতেই দূরে একটা গোঁ গোঁ শব্দ উঠল। শব্দটা জঙ্গলের ফাঁক গলে চিরুনির দাঁতের মত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ক্রমশ বোঝা গেল একটা গাড়ি আসছে। অরুণ ভ্রু তুলে তাকাল বিট্ অফিসারের দিকে। লোকটা জঙ্গলের ওপর চোখ রেখে চিন্তিত গলায় বলল, 'কি জানি, আজতো কারোর আসার কথা নয়। ডি. এফ্. ও. সাহেব তো এই মঙ্গলবার চলে গেলেন।'

আর তখনি জঙ্গল ফুঁড়ে গাড়িটা বেরিয়ে এল। একটা নীলচে এ্যাম্বাসাডার। গায়ে প্রচুর ধুলো জমে; মাথায় ছোটখাটো বেডিং। টিলাটার পাশ ঘেঁষে চলে এল সাঁকোটার মুখে, এসে দুবার হর্ন দিল।

'আপনারা স্যার, একটু—' বোতলগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে বিট্ অফিসার পড়ি কি মরি করে নিচে দৌড়াল।'

'যত শালা ঝুট ঝামেলা। ইনি আবার কিনি।' হরিদাস মুখ ভ্যাটকালো। রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে একটু ঝুঁকে পরিতোষ গাড়িটা দেখতে দেখতে বলল, 'উঁহু, একা-নন সঙ্গে তিনি আছেন।'

'দিল মাটি করে।' অরুণ দাঁত দিয়ে বিয়ারের ছিপি খুলতে গিয়ে কি মনে করে রেখে দিল, 'শালাদের আর কোথাও যাবার জায়গা ছিল না।'

গাড়িটা আস্তে আস্তে তেতরে ঢুকলো সাঁকো পেরিয়ে। বিট্ অফিসার ভদ্রলোকের সঙ্গে কি কথা বলছে ওরা বুঝতে পারছিল না। তবে লোকটার মুখ দেখে মনে হচ্ছে খুব একটা স্বস্তিতে নেই। গাড়ির দরজা খুলে প্রথমে যিনি নামলেন তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ভাল। পরণে খুব দামী টেরিলিনের প্যান্ট আর জন্তু-জানোয়ার আঁকা বুশসার্ট. চোখে চশমা। ওপাশের দরজা থেকে যিনি নামলেন তার দিকে তাকালে কি আগে দেখব ঠাওর করা যায় না। লম্বায় ভদ্রলোকের মাথায়। ছিপছিপে টাইট শরীর আকাশমুখী। ওপরে এক চিলতে ব্লাউজ। ছোট পার্সে একপাশ টাকা ঠেসে পুরলে যা হয়। কোমরের খোলা চকচকে নরম সাপের মত খাঁজগুলো বেরিয়ে শাড়ির শুরু. শাড়িটা সাদা জাপানী জর্জেট। যার ছোট্ট সতর্ক টান নিতম্বকে মোহময় করে তুলতে যথেষ্ট। মাথায়, পরিতোষ অবাক হয়ে দেখল, ছাঁপানো ঘাড় ছোঁয়া চুলে সিল্কের দ্যুতি। চোখ মুখ কিছু না, কিছু না। তবু ভাল লাগে, কারণ ওগুলো যে যার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। গায়ের রঙ চাপা, ফর্সা হলে বোধহয় মানাতো না।

ছোট ছোট পদক্ষেপে নাচের মুদ্রা, ভদ্রমহিলা স্বামীর পাশে দাঁড়ালেন। ওরা পরিষ্কার শুনতে পেল ভদ্রমহিলা চারপাশে চোখ রেখে কি ভীষণ পুলকিত গলায় বললেন, বিউটিফুল, না?' গলাটা ধরা ধরা কিন্তু রক্তে টোকা মারে। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন সম্মতিতে তারপর চাপা গলায় কিছু বললেন। ভদ্রমহিলাকে চকিতে ওপরের দিকে তাকাতে দেখা গেল।

বিট্ অফিসারের পেছন পেছন ওরা ওপরে উঠে এল। ভদ্রলোক ওপরে উঠে একবার আড়চোখে অরুণদের দেখলেন তারপর বিট্ অফিসারকে বললেন, 'আমি শুনেছিলাম বাংলোটা খালি আছে, কোন রুমটা আমাকে দিচ্ছেন।'

'দুটো রুম আছে স্যার। এটাই বেস্ট।' সিঁড়ির মুখের ঘরের পর্দাটা তুলে ধরল বিট্ অফিসার। ভদ্রমহিলা ওদের দিকে তাকান নি, এবার ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন ভদ্রলোকের পিছু পিছু। গাড়ি থেকে বাবুর্চিটা মালপত্র নামিয়ে নিয়ে এল। অরুণদের কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'জলপাইগুড়ি থেকে পাশ নিয়ে এসেছে।'

এই সময় ওরা আবার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভদ্রমহিলা বারান্দার রেলিং-এ দু হাত রেখে পুকুরটার দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন. 'খাওয়া-দাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তো?'

'ইয়া স্যার আছে। বাবুর্চিটা রান্না করে দেবে। চার টাকা ডিল। আজকে বনমুরগী পাবেন।'

চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা, 'কি! বনমুরগী? আঃ গ্রাণ্ড।' হঠাৎ অরুণ খেঁকিয়ে উঠল বারান্দার কোণা থেকে, 'কি মশাই, সবাইকে তো বন মুরগী শোনাচ্ছেন, মেরেছেন তো দুটো।'

'মেরেছেন? মানে আপনি ওয়াইল্ড এ্যানিম্যাল স্যুট করেছেন, বিয়িং এ ফরেস্ট এম্প্লয়ি?' ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে তাকালেন।

'বনমুরগী না মেরে খাওয়া যায় নাকি-জানতাম না।' কথাটা অরুণ গম্ভীর গলায় বলতেই ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন, বললেন, 'চা পাওয়া যাবে এখন?'

'নিশ্চয়ই। আমি এখনই আনতে বলছি।' বলে নিচের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। 'আপনারা খাবেন চা?'

ঘাড় নাড়ল অরুণ, 'না। আমরা এখন অন্য জিনিষ খাবো।' বিট্ অফিসার দ্রুত নেমে গেল নিচে।

পরিচয়ের অবশ্যি হচ্ছিল। কিন্তু অরুণ বেশ সহজ ভাবেই বিয়ারের বোতলটা খুলে ফেলল। তারপর ভদ্রলোকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'ইফ য়ু ডোণ্ট মাইণ্ড, আমরা একটু ড্রিঙ্ক করছি।'

ভদ্রলোক কোন কথা বললেন না। স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের ওপর চোখ রাখলেন। এখন ছায়া বেশ ঘন। টুপ করে যে কোন মুহূর্তেই সন্ধ্যা নেমে

পড়তে পারে। আকাশে একটু একটু মেঘ জমছে। সামনে পেছনে সর্বত্র পাখীর চিৎকার। ওরা বিয়ার খেতে খেতে লক্ষ্য করল, ভদ্রমহিলা ছবির মত দাঁড়িয়ে রেলিং ধরে, ভদ্রলোক যেন কিছুটা অস্বস্তিতে রয়েছেন। তারপর ওরা শুনতে পেল, ভদ্রলোক বলছেন, 'আমি ভেতরে যাচ্ছি।'

মুখ না ফিরিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'না'।

কিন্তু ভদ্রলোক ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। এই লম্বা কাঠের বারান্দায় সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে ওরা তিনজন আর কিছুদূরে ছবির মত ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। তিনটে বোতল যখন শেষ হয়ে এসেছে ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর কেমন নরম গলায় বললেন, 'আপনারা আজই এসেছেন?' পরিতোষ মাথা দোলালো। অরুণ কোন কথা বলল না। হরিদাস দেখছিল অন্ধকারে ভদ্রমহিলাকে কেমন সিলুট ছবির মত লাগছে। 'শিকার করবেন নাকি?' একটু কৌতূহল মহিলার গলায়।

'শিকারের জিনিষ পেলে।' মোটা গলায় অরুণ বলল।

'ও, আমার না খুব ইচ্ছে ছিল—জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে দেখব। কখন বেরুচ্ছেন?'

'দেখি।' অরুণ উঠল। ঘর থেকে আবার তিনটে বিয়ারের বোতল তুলে নিয়ে এল। ভদ্রমহিলা একটু উসখুস করে শেষ পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আরও কিছু সময় কেটে গেলে, বাবুর্চিটা চা দিয়ে গেল, চারধার যখন জমাট অন্ধকারে ঢাকা, শুধু বাবুর্চিটার দিয়ে যাওয়া হ্যাজাকটার ম্যাড় মেড়ে আলোয় বারান্দাটুকু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, অরুণের মনে হল ওর শরীরটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। এরকমটা ওর সাধারণত হয় না, আজকে অনেক দিন পরে, সেই প্রথম প্রথম মাল খাওয়ার সময়ের মত নেশা নেশা লাগছে। বন্ধুদের দিকে তাকাল অরুণ। পরিতোষ বেতের চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে, হরিদাস অনেকক্ষণ থেকে একটাই সুর গুন-গুন করছে। এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়। আজ ছয় বছর সে মাল খাচ্ছে। কন্ট্রাক্টরী বিজনেস শুরু করার পর থেকেই এটার শুরু। সুতপা যে ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা রাগ-ফাগ করে তা নয়। কিন্তু মেয়েরা যা আশা করে, স্বামী তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরুক, এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুনো আর রাত্রে অথবা ছুটির দুপুরে শরীরটা একটু ঘাঁটাঘাঁটি করুক—অরুণ তাও তেই পারে না। বিয়ের পর ম্যাক্সিমাম ছমাস—

একটা অচেনা মেয়ের শরীরে আর কোন রহস্য থাকতে পারে না। বিশেষত তার যদি মা হবার কোন এলেম না থাকে। সুতপার তা নেই। বাঁচা গেছে এক রকম। এখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

পায়ে পায়ে বারান্দার এধারটায় চলে আসতে মেয়েটির গলা শুনতে পেল অরুণ। বন্ধ দরজা কিন্তু ঘরটা কাঠের। মেয়েটির গলায় স্পষ্ট উত্তেজনা, 'মা, খবরদার বলছি, ওসব এখানে হবে না।'

ভদ্রলোক স্পষ্ট বিরক্ত, 'আঃ ঝামেলা করো না।'

ভদ্রমহিলা প্রায় কান্নার সুরে বলছেন, 'তোমাকে নিয়ে আর পারি না, সন্ধ্যে হলেই এক ব্যাপার। আমাকে তোমার ভাল লাগে না এটা আমাকে বলে দিতে পার না? যা ইচ্ছে করো।'

ব্যাপারটা কি? অরুণ কান খাড়া করল। না, আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কেসটা সুবিধের না। অরুণ দেখল, ছাজাকটা নিয়ে পরিতোষ আর হরিদাস ভেতরে চলে যাচ্ছে। ওদের ব্যাপারটা বলা যাক, অরুণ প্রথমে ভাবল। ঠিক সেই সময় আলতো শব্দ হয়ে এ ঘরের দরজা খুলে গেল। এ ঘরের ছাজাকের আলোকে পেছনে রেখে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। অরুণ একটু হকচকিয়ে গেল প্রথমটা। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে নিজেদের ঘরের দিকে এলো। ওর মনে হল ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন অরুণ সব শুনেছে। নিজেদের ঘরের দিকে তাকাল ও। হরিদাস নতুন একটা তাসের প্যাকেট খেকে জোকার বাছছে। পরিতোষ তাকল, 'আর দশ-বিশ স্টেক। আটটা অবধি খেলি।'

'ছুস, ঝুরো খেলতে আর ভাল লাগে না।' কথাটা বলতে পেরে অরুণ যেন বেঁচে গেল। বলে সটান ঘরে ঢুকে আর একটা বোতলে হাত দিল।

'কি ব্যাপার, তাস খেলছেন বুঝি?'

ভীষণ চমকে গিয়ে ওরা দেখল ভদ্রমহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে। পরিতোষ পা এলিয়ে পড়েছিল, এবার সোজা হয়ে বসল। হরিদাস হাসল, 'হ্যাঁ।'

'বেশ আছেন আপনারা? আমি আবার তাস বুঝি না। কখন বেরুচ্ছেন?' ভদ্রমহিলা অরুণের দিকে তাকালেন।

ব্যাপারটা কি? একা একা কেন? স্বামীর সঙ্গে তো জমছে না মনে

হচ্ছে। সাহস আছে মাইরি। তিনটে মাতাল ছেলের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে রাত্রির বেলায় একা কথা বলছে। সুতপা হলে মরে যেত।

'এই দেখি, খেয়ে দেয়ে বেরুবো।' অরুণ বলল, 'আপনার মিস্টার কোথায়? উনি আমাদের সঙ্গে ইচ্ছে করলে যেতে পারেন।' ভদ্রমহিলার বুকের দিকে তাকাল অরুণ। মেয়েদের বুক এত জম জমাট হয় কেন? বিশেষ করে অজানা মেয়ের? সুতপার বিয়ের সময় এরকম ছিল। কিন্তু অরুণ রহস্য পায় না কিছু এখন। জানাশোনা হয়ে গেলে বোধহয় এরকম হয়। ভদ্রলোকেরও বোধহয় ওখানে জমাটি ব্যাপার কিছু নেই।

'না, ওর শরীরটা ঠিক ভাল নেই আজ।' ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন এবার। পরিতোষ চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ, বলল, 'অসুস্থ হলে খবর দেবেন।'

'না তেমন কিছু না।' একটু হেসে উনি চলে গেলেন। ও ঘরের দরজা বন্ধের শব্দ হল। 'দারুণ জিনিস মাইরি।' পরিতোষকে বলতে শুনল অরুণ। ওরা মহিলার সম্পর্কে বেশ সরস আলোচনা করছে তাস হাতে। বোতলটা শেষ হয়ে গেলে অরুণ বিছানার ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। আঃ কি আরাম। আজকে বেশ নেশা হয়ে গেছে। বেশ নতুন নতুন ব্যাপার। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে ও চোখ খুললো। খুলতেই একটু ছোট্ট, পেয়ারের মাথার মত ছোট্ট, আলোর বিন্দু দেখতে পেল।

কিছুটা বিস্মিত হয়ে মুখটা নিয়ে গেল কাঠের দেওয়ালের কাছে, তারপর চোখ রাখল আলোর বিন্দুতে। প্রথমে অস্পষ্ট সব কিছু, অরুণ চোখ বুঁজে নিজেকে ঠিক করে আবার চোখ রাখল। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। ন্যাংটো সেজি আর ফুলপ্যান্ট পরে, পায়ের জুতো জোড়া খোলা হয়নি। শুয়ে আছেন চিৎ হয়ে মুখটা সামান্য হা করা। ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল না অরুণ। পরে বুঝল ভদ্রমহিলা ঠিক দেওয়ালের গা ঘেঁষে ওঘরের খাটে শুয়ে আছেন নিশ্চয়ই। ঘরের ওপাশের অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছে অরুণ। তাই উনি আড়ালে।

কিন্তু ভদ্রলোক ওভাবে পড়ে আছেন কেন? অরুণ ত্রস্ত চোখে মালের বোতল খুঁজলো টেবিলে। না নেই। কিন্তু স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় ভদ্রলোক পুরো আউট। ঘরে ঢুকেই শালা-মাল টানতে শুরু করেছে। অথচ অরুণরা যখন বিয়ার খাচ্ছিল তখন যেন সতীপনা দেখাচ্ছিল। গুরুদেব লোক মাইরি।

এই জন্যেই শালা বৌএর সঙ্গে তখন ছিচ হচ্ছিল। লোকটার জ্ঞান সহজে ফিরবে বলে মনে হয় না। বিয়ের আগে একবার ওর এরকম হয়েছিল। অরুণ ঘরের দিকে তাকাল এবার। ওরা দুজনে তাস খেলে যাচ্ছে। ওদের একবার বলার ইচ্ছে হল অরুণের। কিন্তু আরও কিছু, আরও বড় কিছু দৃশ্যের আশায় ও চুপ করে শুয়ে রইল। এরপর দু-একবার চোখ মেলেছিল অরুণ, না দৃশ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। পাশের ঘরটা যেন ফ্রিজ হয়ে গেছে।

হরিদাসের হাতের দুলুনিতে অরুণ যখন চোখের পাতা খুললো তখন রাত আরো গভীর। ওরা খেতে ডাকছে। বিট অফিসার সামনে দাঁড়িয়ে। নিচের ডাইনিং রুমে খেতে দেওয়া হয়েছে। অরুণ উঠে বসল। মাথাটা টলছে। বলল, 'ওদের বলেছেন?'

হরিদাস একটু অবাক হল। তারপর দাঁত বের করে বলল, 'এরমধ্যেই ওদের জন্যে মাথাব্যথা হচ্ছে নাকি!'

'মিস্টার রায় অসুস্থ। ওরা ঘরেই খাবেন।' বিট অফিসার বিনীতভাবে জানালো।

'তোরা যা, আমি আসছি।' অরুণ বলল।

বিট অফিসারের সঙ্গে ওরা নিচে নেমে গেলে অরুণ আবার চোখ রাখল। ভদ্রলোক তেমনি শুয়ে। টেবিলে দুটো খাবারের থালার সামনে ভদ্রমহিলা বসে। নিজেরটা প্রায় শেষ করে ভদ্রলোকের মাংসটা তুলে নিলেন। তারমানে স্বামীর খাবারটাও উনি খাচ্ছেন। অরুণের কেমন গরম লাগছে মুখ চোখে, ব্যাপারটা কি? এ ঘটনা কি রোজই হয়, রোজই? মোটামুটি খাওয়া হয়ে গেলে ভদ্রমহিলা উঠে একটা খবরের কাগজ বের করলেন ব্যাগ থেকে। তারপর থালার খাবারগুলো তাতে ঢেলে একটা প্যাকেট করে এমনভাবে থালাগুলো রেখে দিলেন যাতে মনে হবে এইমাত্র দুজন খেয়ে উঠল।

খাওয়ার পর ঠিক হল বেরুনো হবে ঠিক বারোটায় সময়। কারণ জঙ্গলটা তখন বেশ চুপচাপ থাকে। জন্তুজানোয়াররা তখন ডেরা ছেড়ে বেরোতে শুরু করে। ভোরের দিকে বেরুলেই সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু ঘুম ভাঙার গ্যারান্টি নেই। তাই রাতই ভাল, সঙ্গে বিট অফিসার থাকবে বন্দুক নিয়ে, বলা যায় না কিছু।

পাশের ঘরের কোন শব্দ পাওয়া যচ্ছে না। হাতে কিছু সময় আছে। ঘুমিয়ে পড়লে অসুবিধে হবে বলে পরিতোষ আর হরিদাস তাস নিয়ে বসল। খেয়ে উঠেই অরুণ বিয়ারে হাত দিয়েছিল। দ্বিতীয়টা শেষ করে আবার দেওয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল খাটটায়। পরিতোষদের এদিকে নজর নেই। ওরা এখন অরুণকে ঘাঁটাতে চাইছে না। কারণ অরুণের হাতে স্টিয়ারিং থাকবে। ওর একটু রেষ্ট দরকার।

পাশের ঘরের একটা জানালার সামনে ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। পেছন থেকে দারুণ লাগছে। ভদ্রলোক পাশ ফিরে শুয়ে। পায়ে জুতো মোজা নেই। প্যান্টটা আছে। বোঝা যাচ্ছে ভদ্রমহিলার হাত পড়েছে। খানিক পরেই মহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকের দিকে একবার তাকালেন। তারপরে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঝুঁকে পড়ে মুখ দেখলেন। শাড়ির আঁচলটা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় ঘুরে সুটকেস খুললেন। অরুণের নেশার ঘোরটা কি দ্রুত পাতলা হয়ে যাচ্ছিল। সুটকেস থেকে একটা কাপড় বের করে পরণের শাড়িটা পালটালেন। আর কাঁচুলি পরে মহিলা শরীর বেঁকিয়ে চুরিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখলেন। তারপর সুটকেস থেকে বের করা কালো জাল জাল কাপড়টা মাথা দিয়ে গলিয়ে দিলেন শরীরে। কাঁধ থেকে পা অবধি স্লিপিং গাউনটা মাকড়সার জালের মত জড়িয়ে রইল।

অরুণ জিপের হেডলাইটের আলো প্রথমবার যখন জ্বাললো তখন সামনের খোলা জমি, টিলা পেরিয়ে জঙ্গলের সারি মুহূর্তেই ঝকঝকে কিন্তু কেমন রহস্যময় লাগলো ওদের। সামনের সিটেই বসেছে সবাই। স্টিয়ারিংএ হাত রেখে চুপচাপ বসেছিল অরুণ। চোখটা এখন পরিষ্কার হয়নি। বিট্ অফিসার বারংবার বলেছে গাড়ি খুব আস্তে চালাতে, কথা বলা চলবে না আর সিগারেট খাওয়া বন্ধ। শেষ পর্যন্ত পরিতোষের ইচ্ছে ছিল না এ অবস্থায় অরুণকে স্টিয়ারিং ধরতে দেওয়া, কিন্তু উপায় নেই, আর কেউ গাড়ি চালাতে জানে না।

অরুণ আর একবার ওপরের দিকে তাকাল। বাংলোর কাঁচের জানলায় অস্পষ্ট মুখ আর শরীরের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে এখনও। অরুণের মাথা ঘুরছিল।

হরিদাস বলল, 'কি হল, স্টার্ট দে।'

হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল অরুণ। বলল, 'দাঁড়া, আসছি।'

তারপর দু একবার হোঁচট খেয়ে কাঠের সিঁড়িটা ধরে ফেলল ও। ভীষণ বিরক্ত গলায় একটা খিস্তি করল পরিতোষ, 'আবার মাল না খেলে চলছে না তোর!'

অরুণ কোন কথা বলল না। কোন রকমে ওপরে উঠে এল। এখন বাংলোটা নির্জন—কি গভীর চুপচাপ। কাঠের বারান্দায় পায়ের শব্দ বাজছে। অরুণ ঘরে এল। টেবিলের ওপর থেকে বিয়ারের বোতলটা তুলে নিয়ে কি ভেবে দেওয়ালের পাশে গিয়ে খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুটোয় চোখ রাখল। একটা লোভের স্রোত বুকের মধ্যে তির তির করছে। কিন্তু সেই একই দৃশ্য, ভদ্রলোক তেমনি ভাবেই শুয়ে আছেন। ফিল্ম করা আলোয় ভদ্রমহিলাকে দেখা গেল না।

'কি দেখছেন?'

ভীষণ চমকে গিয়ে অরুণ দেখল ভদ্রমহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে। একটু অবাক অথচ ঠোঁটের কোণে হাসির ছাপ। পরণে সেই কালো মাকড়সার জাল। অরুণ প্রথমটা আমতা আমতা করে হেসে ফেলল। তারপর সহজ গলায় বলল, 'চুরি করে আপনাদের দেখছিলাম।'

'কি দেখলেন?' খুব শান্ত গলা মহিলার।

'আপনার স্বামীর নেশা ভাঙেনি।'

'কাল সকালের আগে ভাঙবে না।'

'কি এমন নেশা! অথচ দেখুন আমার নেশাই হয় না। এত খাই, শরীর ঠিক ম্যানেজ করে নেয়।' কেমন আফসোস অরুণের।

'মদ ছাড়া অন্যকোন নেশা নেই আপনার?' কি একটা যেন কণ্ঠস্বরে।

'না।'

'আপনি বিবাহিত?'

'হ্যাঁ।' তারপর একটু সাহস করে বলে ফেলল, 'উনিতো সারারাত এভাবে থাকেন আর আপনি?'

'আমি দেখে যাই। আপনার মত মদ খেত একসময়, শেষে তাতেও কিছু হত না। আপনার যেমন হচ্ছে। তারপর কিসব খেত, তাতেও হল না, এখন ইঞ্জেকশন নিচ্ছে। এরপর কি আছে জানি না।'

'আপনার কেমন লাগছে ?'

'আমি ওকে সারারাত ঘেন্না করি। মেয়েমানুষ ছাড়া পুরুষের অন্যকোন নেশা থাকা মানে আমাদের হেরে যাওয়া। আমি তো হেরে গেছি। আপনার বন্ধুরা হর্ণ দিচ্ছে।'

শব্দ শুনতে পেল অরুণ। তারপর দরজার কাছে গিয়ে মহিলার পাশে দাঁড়াল, 'আপনাকে দেখে আমার লোভ হচ্ছে।'

মুখ তুলে হাসলেন মহিলা, 'সেটাই স্বাভাবিক। আপনার স্ত্রী এ অবস্থায় থাকলে আমার স্বামীরও লোভ হত।

কি যেন গলায়, একটা ভৌতিক অথচ নির্জলা সহজ স্বীকৃতি, অরুণের সমস্ত শরীর আর তার নেশাগ্রস্ত শিরা উপশিরাকে সুতো ছেঁড়া ঘুড়ির মত অসহায় করে দিল। বড় বড় পা ফেলতে ফেলতে অরুণ শুনলো ভদ্রমহিলা বলছেন, 'আপনার শিকার দেখতে চাই।'

যতটা আস্তে উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী গতিতে গাড়িটা নড়বড়ে সাঁকোটার ওপর দিয়ে বের করে নিয়ে এল অরুণ। হরিদাস বলল, 'আস্তে।' অরুণ একটা খিস্তি করল। তারপর খুব দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে টিলার বাঁক পেরিয়ে এল। আলোর সময় জিপের দুটো চাকা এমনভাবে উঠে গেল ওপরে পরিতোষ চিৎকার করে উঠল, 'এই শালা, গাড়ি থামা, আমি নেমে যাব।

হরিদাস বিট অফিসারকে বলল, 'কি মশাই আপনার জানোয়াররা কোথায় গেল ?' বিট অফিসার কিছু বললেন না। আরো বেশ কিছুক্ষণ ঘোরার পর ওরা যখন বাংলোর কাছাকাছি এসে গেছে তখন বিট্ অফিসারের হাতের আঙুল অরুণকে ইশারা করল। জিপ থামিয়ে অরুণ বলল, 'কি ব্যাপার ?'

আর তখনই কানে এল। ওপাশের জঙ্গলে ভীষণ শব্দ হচ্ছে। কারা যেন গাছ ভাঙছে। বিট অফিসার বলল, 'হাতি বেরিয়েছে। আলো নেভান শিগগির।'

অরুণ বলল, 'কেন ?'

'আরে আলো দেখলে হাতি ক্ষেপে যাবে।' বিট্ অফিসার অধৈর্য। ঠিক সেই সময় ওদের চোখে পড়ল প্রায় সত্তর গজ দূরে একরাশ অন্ধকারের মত একটা হাতি হেডলাইটের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল। তারপর আর একটা এবং অনেকগুলো। ওরা স্থির হয়ে এদের দেখছে। অরুণ ফিসফিস করে বলল, 'গুলি করুন।'

'মাথা খারাপ। শেষ করে দেবে আমাদের।'

'আঃ গুলি করুন বলছি।' অরুণ চিৎকার করে উঠল। বিট্ অফিসার তড়াক করে নেমে পড়লো নিচে। ফিস ফিসিয়ে বললো, 'আপনারা নেমে আসুন। আমি শর্টকাট রাস্তা চিনি। হাতি এখানে আসার আগেই আমরা বাংলোয় পৌঁছে যাবো। কুইক।' সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষ আর হরিদাস নেমে পড়ল জিপ থেকে। পরিতোষ বলল, 'অরুণ?'

অরুণ কোন কথা বলল না। হাতিগুলো এগোচ্ছে। ওরা পাশের সরু রাস্তা দিয়ে বাংলোর দিকে দৌড়ালো। অরুণ গাড়ির সিটের ওপর চুপচাপ বসে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। সামনের রাস্তায় এক চিলতে ফাঁক নেই। হাতিগুলো সার দিয়ে আসছে। পেছনে ব্যাক করা যাবে না। এখন আকাশ পরিষ্কার। তারার আলোয় অরুণ দেখল, হাতিগুলো একদম সামনে এসে পড়েছে। গাড়ির গায়ে কিসের শব্দ শুনতে পেল অরুণ। স্টিয়ারিংএ মাথাটা রেখে চোখ বুঁজলো অরুণ। দুপাশে হাতির গন্ধ পাচ্ছে ও। জিপের সঙ্গে গা ঘষে হাতিগুলো চলে যাচ্ছে। শুঁড় দিয়ে বোধহয় একটা ছুঁয়ে গেল অরুণকে। হাতিগুলো চলে গেল। ছাগলের পাল যেমন মধ্যে কিছু পড়লে পাশ কাটিয়ে যায়। এখন সব চুপচাপ। স্টিয়ারিংএ মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল অরুণ। হাতিগুলো যেন অবহেলা করে ওকে শিকার করলো না। হাসি পেল অরুণের। তারপর চোখের বন্ধ পাতায় নিজের মুখটাকে মনে করতে চাইল অরুণ। আশ্চর্য, নিজের মুখটাকেই চোখ বন্ধ করলে দেখা যায় না যে।

প্রভাসকান্তি ভদ্র

সূর্যের মুখ চেয়ে

তার নাম তরুণ। শরীর মন বয়সেও তারুণ্য। ছয় ফুট দীর্ঘ চেহারা। গৌরবর্ণ। শক্তসবল পেশী। ভাল স্বাস্থ্য। সপ্রতিভ এবং বুদ্ধিদীপ্ত ঠোঁট নাক চিবুক চাহনি। হিপিদের মত ঝুলন্ত লালচেপনা ঘন চুলের অরণ্য। গালপাট্টা জুলফি। পরণে বেলবটম প্যান্ট ডোরাকাটা বিচিত্রবর্ণ নক্সাকাটা বুশসার্ট। কখনও বা প্যান্টের ওপর গুরু পাঞ্জাবী—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে অনেক কাল হল ভোরের সূর্য দেখতে ভুলে গেছে। কেননা, রাতে নেশা টেশা করে। স্বভাবতই ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা গড়িয়ে যায়। তার একান্ত নিজস্ব ঘরে পিতৃপিতামহের তৈলচিত্র। ওয়াড্রোব আলমারীতে রকমারী স্যুট পোশাক আশাক। টাই মোজা জুতো সাজানো. কয়েক প্রস্থ। মেঝের পাতা দামী কার্পেট। ওপরে জানলোপিলো খাট সোফাসেট। ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের রেকর্ড রেডিওগ্রাম এবং টেপরেকর্ডার। বনেদী ডিজাইনের আলো পাখা ঘড়ি। ফ্লাওয়ারভাস এ্যাকোরিয়াম এবং কিছু মাটির লৌথিন শিল্প-সামগ্রী—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এসবই তার প্রাণমন জীবনের সঙ্গে একাত্ম। অথচ ইদানীং ঘুম ভাঙলেই পুবের জানলায় তার প্রথম দৃষ্টি পড়ে। সে খোলা জানলা দিয়ে মুক্ত আকাশ দেখে। উজ্জ্বল রোদ্দুর দেখে। বোগনভেলিয়া গাছ দেখে; এবং বুক ভরে মুঠো মুঠো বাতাস নেয়। আজও ঘুম ভাঙতে প্রতিদিনকার মত সে জানলায় চোখ মেলল। দেখল, বাইরে বিস্তীর্ণ মেঘলা আকাশ। রোদ্দুর কোথায়! চারদিক ঘন অন্ধকার। বৃষ্টির পূর্বাভাস। সে বিমর্ষবোধ করল। মেজাজটা বিগড়ে গেল। ভাবল, আজকের দিনটা নির্ঘাৎ খারাপ যাবে।

রাতে তার মাথার বালিশের পাশে সিগারেট প্যাকেট এবং লাইটার থাকে। তন্দ্রালু চোখে সেগুলো হাতড়ে নিল। একটামাত্র সিগারেট অবশিষ্ট ছিল। ঘুমের মধ্যে সেটাও কেমন যেন চেপ্টে গেছে। সে আদর করার মত সেটাকে স্বাভাবিক চেহারায় ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল। তারপর ঠোঁটে ঝুলিয়ে

লাইটার জ্বালল। ধরালো। খালি প্যাকেটটা বিরক্তির সঙ্গে দূরে ছুঁড়ে ফেলল। নিস্তব্ধ ঘরে টুপ করে একটা আওয়াজ ধ্বনিত হ'ল। সকালে বিছানায় শুয়ে এমন ধোঁয়া ওড়ানো তার নিত্যকার অভ্যাস। রাতের অবসাদ এবং ভোরের আলস্য ছাড়াতে সিগারেটের ধোঁয়া তার কাছে টনিকের কাজ করে। কিন্তু লম্বা লম্বা টান দিয়েও সে তেমন ধোঁয়া পেল না। ফলত জলন্ত টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল। তারপর বালিশ আঁকড়ে নিশ্চুপ শুয়ে থাকল। শুয়ে শুয়ে ভাবল, পৃকাশ ঊর্ধ্ব বাবা আমার কাল রাত্তিরে বাড়ী ফেরেননি। চেকনাই জামাকাপড় পরে কলকাতায় গেছেন; প্রায়শই এমন করেন। সোনাকথা—সেখানে রক্ষিতা আছে।

কাল রাত্রে সে ওপরতলায় তার এই ঘর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত দিদির ঘরে আলো দেখেছে। সাপের হিস হিস শব্দের মত পুরুষকণ্ঠ শুনেছে। এসব দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে কেবলি মৃত মায়ের কথা মনে পড়ছিল। বাবার কারখানার মালিক মিঃ আগরওলা স্রেফ টাকার জোরে মার ঘরে ঢুকতো। কতকিছু উপহার দিত। বাবা খুশীতে গদগদ। আর এখন দিদি? ভাবতে ঘেন্না ধরে। বিয়ের মাত্র তিন মাস পরে সেই যে দিদি ঘরে ফিরে এল আর স্বামীর ঘর করতে গেল না। সে তার দিদির কত কিছু গোপন খবর জানে। দিদি কুমারী মেয়ে সেজে প্রণয় প্রণয় খেলা করে। রেস খেলে। সিনেমা থিয়েটার নাইট ক্লাবে যায়। প্রাইভেট গাড়ীর চাকায় ধুলো ওড়ায়। বড় বড় বুকনিতে সব কিছুই উড়িয়ে দিতে চায়—আরো কত কী যে। বস্তুত দিদি নিজেই একটি বেলজ্জ উড়নচণ্ডি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, সে তীব্র প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। কিন্তু তার আগেই দিদি একরাশ টাকা দিয়ে তাকে নিস্তেজ করে দেয়।

তার মাথার কাছে টেবিলে কয়েকটা ইংরেজি নভেল জার্নাল এবং অবসীন পেপার। একটা ওয়াটারবেরীজ কম্পাউণ্ড-এর বোতল। আসলে ওটার ভিতর মদ থাকে। সে সাধারণতঃ বাড়ীতে ড্রিঙ্ক করে না। আবার মাঝে মধ্যে না করেও পারে না। সেজন্যেই রাখা। গতরাত্তের কথা ভাবতে ভাবতে আজকে এই সকালে কেন জানিনা তার মদ খাওয়ার ইচ্ছে হ'ল। সে হাত বাড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায় বোতলটা টেনে নিল। এক চুমুকে বেশ খানিকটা খেয়েও ফেলল। তারপর দীর্ঘক্ষণ মৃতবৎ পড়ে থাকল। অবসাদ ক্লান্তি এবং নিঃসঙ্গতায় ক্রমশ বিমর্ষবোধ করল। একটা হিমশীতল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবনার গভীরে তলিয়ে যেতে যেতে শূন্যতায় পেয়ে বসল। তার কেবলি মনে হ'ল,

তরুণ নামে একটি ছেলে তার ছোটবেলায় ভাল ছবি আঁকতে পারত। সে তার বাবাকে রঙ তুলি কিনে দিতে বললে বাবা মেজাজ দেখাতেন। বলতেন, ওসব ছেড়ে মন দিয়ে পড়াশুনো ক'র। সে একবার স্কুল ম্যাগাজিনে কবিতা লিখেছিল। চ্যাটার্জি স্যার পড়ে তারিফ করেছিলেন। বলেছিলেন, চর্চা চালিয়ে যাও তোমার হাত ভাল। সেই ভরসায় তার ডায়রীর পাতায় অনেক কবিতা জমেছিল। কী করে জানিনা সে সব একদিন বাবা দেখে ফেলেছিলেন। সেকি বকুনি! ভাগর ভাগর রক্তচক্ষুর শাসন। বিচ্ছিরি মুখ খিঁচিয়ে বলেছিলেন, ওসব কল্পনায় কবতে লিখে পেট ভরবে না। ভালকরে পড়াশুনো ক'র।

তার অপরাধটা যে কোথায় তা সে আজো বুঝে উঠতে পারে না। সেদিন বাবার কথায় দারুণ-দুঃখ পেয়েছিল। তারপর থেকে ছবি আঁকা কবিতা লেখা শেষ। পরম বাধ্য ছেলের মত ভাল করে পড়াশুনো করল। স্কুল পাশ করল। ভাবল, সাহিত্য নিয়ে কলেজ পড়বে। কিংবা আর্ট কলেজে ভর্তি হবে। সেদিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। অথচ ইচ্ছেটা প্রকাশ করার মত মানসিক দৃঢ়তা ছিল না। তবু মনে মনে প্রস্তাব রাখার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার আগেই বাবা মিলিটারী শাসকের মত বলপূর্বক নিজের ইচ্ছেটাই চাপিয়ে দিলেন। বললেন, সাইন্স নিয়ে পড়। ভবিষ্যতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কিংবা অনেক রকম টেকনিক্যাল লাইন আছে। ফিউচার ভাল।

আজকাল প্রায়শই তার মনে হয়, তার ব্যক্তিগত ফিউচার নিয়ে বাবা এতটা বেশী মাথা না ঘামালেই বোধহয় ভাল করতেন। কেননা, তিন তিনবার পরীক্ষা দিয়েও সে গ্রাজুয়েট হতে পারেনি। কেমিস্ট্রী ফিজিক্স ম্যাথস সাবজেক্টগুলো বেধাপ্পা বড়। কিছুতেই মাথায় ঢোকেনা। তার নিশ্চিত ধারণা, কস্মিনকালেও সে পাশ করবে না। তবু বাবাকে এখনো এই বয়সে বড় বেশি ভয়। বাবা প্রায়শই বলেন, চেষ্টা চালিয়ে যাও। পাশ তোমাকে করতেই হবে। অন্তত গ্রাজুয়েট ডিগ্রীটা চাই। তারপর কারখানায় খুতে ফরেন পাঠাব। ফিরে এলেই ভাল পোস্ট পেয়ে যাবে। মিঃ আগরওলার সঙ্গে কথা একরকম ঠিক হয়েই আছে।

সুতরাং তাকে পড়তেই হচ্ছে। পড়া অর্থে কলেজ যাওয়া আসা। নিয়মিত টাুইশন ফি চুকিয়ে খাতায় পার্সেন্টেজ রাখা। তার বেশি কিছু নয়

পড়তে তার আদৌ ভাল লাগে না। কোনদিন বই নিয়ে বসেও না।

সুতরাং যথারীতি প্রতিদিনকার মত সে বাথরুম গেল। প্রাতঃকালীন যাবতীয় পরিচ্ছন্ন পর্ব সমাপ্ত করল। সে ঘরে চা খায় না। ঘরের চায়ে তাঁর মন ভরে না। সেজন্য রেস্তোরাঁয় যায়। আজও যাবে। যাবার আগে প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবীটা গলিয়ে নিল। চুলের অরণ্যে চিরুনী বোলালো। তারপর বেরিয়ে গেল

মোড়ের মাথায় রেস্তোরাটা ইতিমধ্যেই বেকার যুবকদের একচেটিয়া দখলে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ক্রমশঃ ভীড় বাড়ছে। আড্ডা জমজমাট হয়ে উঠছে। চায়ের ধোঁয়া এবং সিগারেটের ধোঁয়া একাকার। গুল তাল্লি যুকনির চূড়ান্ত। মুখে রাজা উজীর মারা এখনো সুরু হয়নি। এখানে এলেই কেন জানিনা তার বিশেষ বন্ধু সংগ্রামের কথা মনে পড়ে যায়। সংগ্রাম কোথায় যেন চলে গেছে। অনেক দিন হ'ল তার কোন খোঁজ খবর নেই। নিরুদ্দেশের আগে সংগ্রাম হামেশা বলত, আমার আর ভাল লাগে না। কলেজ পাশ করেছি দু'বছর হ'ল। দু'বছর সমানে আড্ডা দিয়ে আর সময় কাটে না। বড্ড এক ঘেঁয়েমি লাগে। সুতরাং সে আর আসেনি।

সংগ্রামের কথা ভাবতে ভাবতে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। ডবল ডিমের পোচ দু'পিস টোস্ট এবং এক কাপ ডবল ছাঁক চা অর্ডার দিল। নিউজ পেপারটা কাছে টেনে নিল। সবে কেনা কিং সাইজ ফিল্টার উইল্‌স-এর প্যাকেট খুলে একটা ঠোঁটে ঝোলালো। বিলিতি লাইটারের নীলাভ ফুয়েল থেকে সিগারেট ধরালো। বাদশাহী মেজাজে ধোঁয়া উড়িয়ে পেপারের পাতাগুলো উল্টে গেল। হেডলাইন সিনেমার পাতা খেলার পাতা দিনের বাণী এবং কটোটটো দেখল। সবশেষে আইন আদালতের খবরে মন দিল। খাবার এল। খাবার খেল। চা এল। চা খেল। আবার একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ওড়াতে থাকল। সারিবদ্ধ ছোট বড় ধোঁয়ার রিং-এর দিকে নিষ্পলক চোখ চেয়ে চেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। তার কেবলি মনে হল, কাল অনেক রাত পর্যন্ত দিদির ঘরে আলো দেখেছে। সাপের হিস হিস শব্দের মত পুরুষ কণ্ঠ শুনেছে। পঞ্চাশ উর্ধ্ব বাবা চেকমাই জামাকাপড় পরে কলকাতায় গেছেন ; এবং রাত্তিরে বাড়ী ফেরেননি। সংগ্রাম হামেশা বলত, আমার আর ভাল লাগে না। সংগ্রাম কোথায় যেন চলে গেছে।

সর্বশেষ কোণের টেবিলটা অপেক্ষাকৃত জুনিয়রদের দখলে। আড্ডাটা

সময়ে ওদের একান্ত নিজস্ব হয়ে গেছে। এতক্ষণ ওদের মধ্যে সিনেমা খেলা রাজনীতি এবং কী সব তরুণী চর্চা চলছিল। অনেক রকম কেচ্ছা কাহিনী নিয়ে আলোচনাটা এক সময় বিতর্কে রূপান্তরিত হ'ল। তারপর টেবিল চাপড়ানো চিৎকার গালিগালাজ এবং ধমকানোতো গড়ালো।—এসব রোজকার ঘটনা। সুতরাং সে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখা বা শোনার উৎসাহ বোধ করল না। সে স্পষ্ট জানে, এরপর দু একজন হয়তো রাগের মাথায় বাইরে বেরিয়ে যাবে। কেউবা ক্লান্তিতে চুপচাপ বসে থাকবে। কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে যাওয়া ছেলেগুলো আবার ফিরে আসবে। সকলে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যাবে। কেননা, নতুন কোন পথ বা নিশানা ওদের জানা নেই। ওরা গাছের মত গলা জড়িয়ে বেঁচে বর্তে আছে।

ছোট্কা লুঙ্গির ওপর সার্ট চড়িয়ে বেরোয়ার চুকল। আঙুলের ডগা দিয়ে চোখের পিঁচুটি মুছতে মুছতে তার সামনের চেয়ারে বসল। বলল, শুরু তুমি একা একা বসে? এতক্ষণ ব্যাপারটা সে তলিয়ে দেখেনি। ছোট্কার কথায় চমক ভাঙল। মনে হ'ল, তাইতো! নিজেকে এই প্রথম তার বড় একা এবং নিঃসঙ্গ মনে হ'ল। তার মায়ের বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখটা মনে পড়ল। দিদির ঘরে সাপের মত হিস হিস পুরুষ কণ্ঠ। পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বাবা কাল রাত্তিরে বাড়ী ফেরেননি এবং সংগ্রাম এখানে আসে না। সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছোট্কাকে জিগ্যেস করল, সংগ্রামের কোন খবর জানিস?

—হ্যাঁ। সে তো এখানেই আছে।

—এখানে আসেনা তো।

—সময় কোথায়। ওতো বাড়ীর কাছেই একটা প্রেস খুলেছে। সেইসঙ্গে সাইনবোর্ড লেখে। ছবিটবিও আঁকে। মনে হয় ভালই কামাচ্ছে।

'ছবিটবি আঁকে' কথাটায় সে আবার উন্মন হ'ল। ছেলেবেলাকার কথাটা চেউ খেলে খেলে কাছে এসে এল। আবার দূর হ'তে দূরান্তে মিলিয়ে গেল। তার কেবলি মনে হ'ল, সে ভাল ছবি আঁকতে পারত। ডায়রীতে অনেক কবিতা লেখা ছিল এবং সে সাহিত্য নিয়ে পড়তে চেয়েছিল।

ছোট্কা বলল, শুরু আমার জন্য এক কাপ চা অর্ডার হোক। সে চায়ের অর্ডার দিল। ছোট্কা বলল, শুধু চা? টোস্ট হবে না?

—আমার বাপের জমিদারী আছে? কথাটা বলেও সে টোস্টের অর্ডার দিল। ছোট্কা বলল, কী যে বল শুরু, তোমার নয়তো কী

আমার বাপের জমিদারী আছে? তুমি যেন আজকাল কেমন চিম, পাটি হয়ে যাচ্ছ।

—তোর যা ইনকাম তাতে বাপের জমিদারীর পরোয়া কিসের।

—না গুরু। ছোট্‌কা টোস্ট চিবোতে চিবোতে বলল, বাজার খুব মন্দা যাচ্ছে। শালা দুনিয়াটা সব সৎ হয়ে গেল। খুন জখমের বাজার গেল। কি বছর ইলেকশান বন্ধ। আবার বলে কিনা চুরি ডাকাতি জাল জুয়াচুরি কিছু চলবে না। অথচ চাকরির বেলায় তো তো তো। লে বাবা থাকব কী নিয়ে?

—যা বলেছিস মাইরী। ছুঁড়ে দেয়া কথাটার সূত্র ধরে ছোট্‌কা পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, মদন সাইকেল দাঁড় করিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে মদন আবার কথা জুড়ল, কী নিয়ে থাকব—এটা একটা গ্রেট প্রব্লেম। অনেক ধিক্ক করে আমি তাই বাড়ীর রেশন বাজার করার কাজটা হাতে নিলাম।

—ওসব নক্‌সা ছাড় মদনা। ছোট্‌কা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, তুই শালা নিজের গেঞ্জি আণ্ডারওয়ার পর্যন্ত বোনদের দিয়ে কাচাস—রেশন বাজার কী আর অমনি করছিস?

—অমনি করছি কোন শালা বলেছে। আমার ঝুট ঝামেলা বিলকুল ভাল লাগে না। আগে এসব বুড়ো বাপটাই করত। টু পাইস কামাবার ইন্‌টারেস্ট আছে তাই আমি করছি।

—আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ। ছোট্‌কা কোড়ন কেটে বলল, তোর নজর মাইরী খুব ছোট। শেষকালে ঘরের ওপর ট্যাকস!

মদনের মেজাজ তিরিক্কি হয়ে গেল। বিশেষত ছোট্‌কার বলার ধরনে যে শ্লেষ ছিল তা দুঃসহ। উপরন্তু ওর হাসিটা তীক্ষ্ণ সূঁচের মত গায়ে বিঁধল। ফলত রাগে দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে খিস্তি দিল, মেলাই ভ্যাটকাস্ না। তোর বাপ যা ঘুঘু, তাই চাপ পাস না। নইলে ছাড়তিস?

—ওসব হিঁচ্‌কেমিতে ছোট্‌কা নেই বুঝলি।' ছোট্‌কা জেন্‌আরাস রিস্ক নিয়ে বড় বড় কারবার করে।

তর্কটা হয়তো অনেকদূর গড়াতো। মদনই গড়াতে দিল না। কারণ সে জানে, ছোট্‌কার মত স্মাগ্‌ল্ কারবার করার সাহস তার সত্যিই নেই। সুতরাং সে চুপসে গেল। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলল, উপায় কী? ঠ্যালায় পড়লেই

করতে হয়। শালা পুজোগুলোও আজকাল হেভি দেরী করে আসছে। কম্পিটিশানের পুজোয় প্রফিটের বাজারও ডাউন।

সে চুপচাপ দু'জনের কথা শুনে যাচ্ছিল। এতক্ষণ কোন জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করছিল না। মদন তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, দেবারকার মত একটা চোস্ত ফাংশানের ব্যবস্থা করে দাও না গুরু। তোমার ক্যাপিটাল আমাদের লেবার। তোমার নাম—আমাদের আখেরে বড়িয়া কামান—গ্রাণ্ড ম্যাচিং হবে। সে এই প্রথম মুখ খুলতে বাধ্য হ'ল। অভিভাবক সুলভ হিতৈষীর ভঙ্গিতে বেশ কিছুটা নির্দেশের মত বলল, ওসব বাজে ধান্দা ছাড়। কাজকর্মের চেষ্টা কর এখন থেকে।

—পছন্দ হ'ল না বুঝি? বেশতো, বাঁচার একটা পথ বাতলে দাও না। অন্তত তোমার বাবাকে পাকড়ে কারখানায় যে কোন একটা কাজ জুটিয়ে দাও। ভাইয়া বলছি, হোল লাইফ তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

মদনের মুখে শেষের কথাগুলো দারুণ বিষণ্ণ ও করুণ শোনাল। যেন অনেকদিনের স্তূপীকৃত চাপ চাপ দুঃখ কান্না হয়ে গলে গলে পড়ছিল। সে তাৎক্ষণিক কোন জবাব খুঁজে পেল না। বুকের ভিতর একটা গোপন যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল। সেটা ক্রমশই অশান্ত ও প্রকট হয়ে উঠছিল। সে কেমন যেন আনমনা হয়ে চিন্তার গভীরে তলিয়ে যেতে থাকল। তার কেবলি মনে হ'ল, সে তার যৌবনের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে বয়সের ঊর্ধ্ব সীমানার দিকে এগিয়ে চলেছে। বাবার সোনার খাঁচা আজকাল তার কাছে ক্রমশই দুঃসহ হয়ে উঠছে। সেজন্য নিজেও মনে মনে অনেকদিন থেকে আত্মনির্ভর বাঁচার একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই তার কোন হদিশ পাচ্ছে না। ভাবতে গিয়ে সে জরো রুগীর মত অবসাদ বোধ-করল। আত্মগ্লানিতে চুপসে গেল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে বলল, চাকরির বাজার খুব মন্দা যে মদন। বরং ব্যবসা ট্যবসার চেষ্টা কর।

—ওই এক কথা। মদন কিছুটা অসন্তুষ্টির স্বরে কটাক্ষ করল, যার কাছে চাকরি চাইবে অমনি শুনিয়ে দেবে—ব্যবসা কর। ব্যবসা যেন হাতের মোয়া। বলি, টাকা দেবে কোন বাপ। এক বাপ ব্যাঙ্ক নাকি লোন দিচ্ছে। সেও শালা মর্টগেজ চাই। গ্যারান্টার চাই। ভাল রকম তেল চাই আরো কত কিছু চাই।

—বাপের সম্পত্তি বলতে তো একগণ্ডা দিকদিকে কাচ্চা বাচ্চা। ছোট কা

মন্তব্য ছুড়ে বলল, আমাদের প্রয়োজন কেউ ফিল করে না মাইরী। লীডাররা যে যার ধান্দায় আছে—কিছু গুছিয়ে নিতে।

সে কোন জবাব দিল না। অবশ্য জবাব দেবার মত কোন উত্তরও জানা নেই। সুতরাং চুপচাপ থাকল। এক সময় মদন উঠে দাঁড়াল। বলল, চলি—আমার আবার সঙ্গে বাজার রয়েছে। কাউকে উদ্দেশ না করেই কথাটা বলা। সে মদনের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। ছোট্‌কাকে একটা দিল। নিজে একটা নিল। তারপর আগুন ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, জানিস মদন তোদের রাগ বা ক্ষোভটা স্বাভাবিক। বিশ্বাস করবি কিনা জানিনা—বাবার সঙ্গে আমার বনিবনা নেই। বাবা ইচ্ছে করলেই অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু আমি জানি, অন্তত তোদের জন্য কিংবা সমাজের স্বার্থে বাবা কিছু করেননি—কোনদিন করবেন না। তিনি তার নিজের সুখভোগের বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না। তিনি আমার মা-কে—। বাকি কথাটা বলতে গিয়েও তৎপরতার সঙ্গে সামলে নিল। একমুঠো বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। অথচ, তার ইচ্ছে হচ্ছিল, উচ্চকিত কণ্ঠে চিৎকার করে তার বাবার মুখোশটা খুলে ধরে। দুনিয়ার লোককে তার বাবার কেচ্ছা কাহিনী শুনিয়ে দেয়। পারল না। কোথায় যেন হোঁচট খেল।

সে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছিল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। তার ধমনীতে পিতৃপিতামহের রক্তপ্রবাহ। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, যৌবনের রক্ত এত সহজে কেমন করে স্তিমিত হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে মনে হয়, তার রক্তে কোথায় যেন খাদ আছে। নির্ভেজাল রক্ত কখনও এত সহজে শীতল হতে পারে না। খাঁটি রক্তপ্রবাহ নিশ্চিত উষ্ণ। তেমন উষ্ণ রক্তপ্রবাহ তার একান্ত প্রয়োজন। কেননা, উত্তপ্ত রক্ত-প্রবাহে সে অন্তত বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারত। বাবার গড়া সোনার খাঁচাটা ভেঙে তছনছ করে দিত। তারপর আত্মনির্ভর মুক্ত পথ খুঁজে নিত।

ছোট্‌কা অনেকক্ষণ ধরে তাকে নিরীক্ষণ করছিল। তার মনের অবস্থাটা অনুমান করে বলল, এসব কথা কিন্তু তোমাকে বলা নয় শুক্ল। তোমাকে তো আমরা ছোটবেলা থেকে জানি। বড়লোকের ছেলে হয়েও আমাদের সঙ্গে দোস্তিটা ঠিক রেখেছো। টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করছো। চাকরির লাইনে তোমার হাত থাকলে নিশ্চয়ই বলতে হ'ত না।

মদন আবেগের সঙ্গে কথা ছুড়লো, তুমি আমাদের ভালবাস বলেই তো

তোমাকে দুঃখের কথা শোনাই। জানো, মা-র আবার একটা বাচ্চা হবে। বাপ তো নয়—একটা শত্রু। জন্ম দিয়েই খালাস। হঠাৎ যদি বাপটা এখন টেঁসে যায় তো পস্তাতে হবে আমাকে। আমি শালা অতই বুদ্ধু! একটা কিছু হিল্লে হলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব। কোন শালা আটকায়।

কথাটা শেষ করেই মদন সাইকেলের প্যাডেলে জোর চাপ দিল। নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ছোটকাও চলে গেল। সে কব্জি ঘড়িতে সময় দেখল। বিল মেটালো। তারপর রাস্তায় নেমে এল। বাড়ী মুখে পথ চলতে চলতে সে মেঘলা আকাশ দেখল। গুমোট গরম অনুভব করল। বিক্ষিপ্ত চিন্তাসমষ্টি নাড়াচাড়া করল। ভাবল, মদন কত সহজে তার বাবার বিরুদ্ধে বলতে পারে—আমি পারি না। মদন যে কোন একটা কাজ চায়। অর্থাৎ নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়—আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার কথা ভাবতে পারি না। কেন এত সব গুলেক কিছুই পারি না? আত্মজিজ্ঞাসায় নিজেই উত্তর দিল, বোধহয় বাবা অচেল স্বচ্ছলতা এবং বিলাসিতায় সমস্ত শক্তিটুকু কেড়ে নিচ্ছে। স্বভাবতই তার আবার মনে হ'ল, আমার ধমনীতে পিতৃপিতামহের রক্তপ্রবাহ। অতীত ঐতিহ্য এবং তার ট্রাডিশান। ট্রাডিশান অর্থে—গাড়ী বাড়ী অগাধ অগাধ সম্পদ। ভোগ বিলাস মদ মাংস মেয়েছেলে। সৌখিন আসবাবপত্র ঝাড়লণ্ঠন এবং নিজস্ব পানগৃহ। দেওয়াল স্তম্ভে বর্ণালী শাসিটুকরো। নগ্ন নারীর তৈলচিত্র বেনামী জমি এবং গোপনে রাখা কালোটাকা।

এখনো ক্লাসে প্রফেসর আসেননি। সে ক্লাসে ঢুকতেই দেখল, লাস্ট বেঞ্চে বসে শ্যামল বিড়ি টানছে। তাকে উদ্দেশ করে শ্যামল শিবনেত্র মুদ্রা করে আহ্বান জানাল, হবে নাকি একটান? ভিতরে আসলি মাল আছে। সে মাঝেমধ্যে এসব যে না খায় তা নয়। তবে ক্লাসে কোনদিন খায়নি। এতদিন এসব ছিল না। মানে ক্লাস চলাকালীনও অনেকে মাথা নীচু করে লুকিয়ে চুরিয়ে খায়। এসব তার খুবই অপছন্দ। এমনিতেই মেজাজটা আজ সকাল থেকে ভাল নয়। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। অথচ একফোঁটা বৃষ্টি হ'ল না। অসহ্য গুমোট গরম। বিদ্যুৎ বিকল। সে সবিশেষ বিব্রত ও বিরক্ত হ'ল। বলল, এসব আমার ভাল লাগে না। শ্যামল ধোঁয়া উড়িয়ে কটাক্ষ করল, ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। সে কোন জবাব দিল না। হাতের তালুতে গাল পেতে নির্বাক বসে থাকল। প্রফেসর ক্লাসে এলেন। সম্মানসূচক দাঁড়িয়ে পড়া

ছাত্রছাত্রীদের আড়ালে পিছনের বেঞ্চের অনেকেই উঠে দাঁড়াল না।

শ্যামলের বিড়িটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রফেসর বি সি পড়িয়ে যাচ্ছিলেন। শ্যামলের শুনতে ভাল লাগছিল না। সে কেবলি উসখুস করল। খাতা খুলে আঁকিবুকি কাটল। কী একটা বিলিতি ম্যাগাজিন খুলে মুখ ঢেকে দিল। তারপর খাতার পাতায় গীতা রমলা শেলী শ্যামল রথীন দীপেন ছয় জনের নাম লিখল। সে অনেকক্ষণ ধরে শ্যামলের এসব আচরণ লক্ষ্য করছিল। ছ' জনের নাম লেখা সম্পর্কে কৌতূহল হ'ল। ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করল, এ সব কী লিখছিস?

—উইক এণ্ড ট্যুরে যাব। যাবি তো?

—কোথায়?

—নামটা এখন বলা যাবে না। ভেরী সিক্রেট এ্যারেঞ্জমেণ্ট। খুব নিরিবিলি মফস্বলের বাগান বাড়ী। পটলীরা তো সঙ্গেই যাচ্ছে—সুতরাং বটলীও থাকবে। যাস তো বল—নামটা লিখে নেই।

—না।

শ্যামল একটু আশ্চর্যবোধ করল। এমন একটা সুযোগ হাতে পেয়েও সে ছেড়ে দিচ্ছে ভাবতে কষ্ট হ'ল। ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে মনে হ'ল। বিস্ময়ের সঙ্গেই জিগ্যেস করল, ব্যাপার কী বলতো। আজ সবকিছুতেই না বলছিস। রাতারাতি এত পাল্টে যাবার কারণটা কী—কোথায় চোট খেয়েছিস? সে কোন জবাব দিল না। পড়া শুনতে ভাল লাগছিল না। ওসব বড় বড় ব্যাখ্যা তার মাথায় ঢোকে না। তবু প্রফেসরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পড়া শোনার ভান করল। ভাবনাটা উইক এণ্ড ট্যুরকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেতে থাকল। ভাবল, ওরা নির্ঘাৎ সেবারকার পিকনিক প্রোগ্রামের চেয়ে বড়রকম একটা নষ্টামী করতে যাচ্ছে। গীতা রমলা শেলী হোস্টেল থাকা মেয়ে। বাড়ী যাবার নাম করে সহজেই পালাতে সুযোগ পায়। সেবার গীতা বড্ড বেশি মদ খেয়ে রাস্তায় বেলেল্লাপনা করেছিল, ফলত থানায় যেতে বাধ্য হয়েছিল। শেলী গাঁজা ভরা সিগারেট টেনে সে কি কাণ্ড—সামলানো দায়। রমলা জঙ্গলের ভিতর রথীনের সঙ্গে? সেসব ভাবা যায় না। ব্যাপারটা আদৌ ধরা পড়ত না যদি না রথীনের পকেটে ওসব ট্যাবলেট ট্যাবলেটগুলো নজরে পড়ত। তখন থেকেই ওদের ওপর লুকিয়ে কড়া নজর রাখা হয়েছিল তাই—।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ক্লাস শেষ হতে রথীন কাছে এগিয়ে এল। বলল, কিরে তুই দেখছিলাম খুব মন দিয়ে বি. সি-র পড়ানো শুনছিলি। কোন জবাব প্রত্যাশা না করে আবার কথা জুড়ল, ও ব্যাটা আবার কবে থেকে পড়াতে শিখলো। আমাদের মত স্রেফ টুকলি করে পাশ করা ছেলে। নেহাৎ খুঁটির জোর ছিল, ভাল অয়েলিং পারে—তাই চান্সটা পেয়ে গেছে।

সে একথারও কোন জবাব দিল না। এখন অফ পিরিয়ড। সুতরাং ক্লাস ঘরে বেশ জমজমাট ভাব। কেউ টেবিলের ওপর বসে মেয়েদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা রসিকতা করছে। কেউবা হাই বেঞ্চের ওপর লম্বা পা তুলে মনের সুখে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। হিন্দী ফিল্মি গানের গুনগুন কলি ভাজছে। জায়গায় জায়গায় জটলা। কিচির মিচির কথাবার্তা। উচ্চ নিম্ন হাসির ফোয়ারা। রথীনের কথার সূত্র ধরে দীপেন জিগ্যেস করল, বি. সি. মানে জানিস? নামের সঙ্গে হুবহু মিল আছে মাইরী। অশ্লীল ইংগিতপূর্ণ কথাটা শুনে সামনের বেঞ্চ থেকে গীতা পিছন ফিরে তির্যক তাকালো। মৃদু হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। দীপেন দারুণ কিছু একটা মন্তব্য ছুঁড়ে গীতার সমর্থন পেয়েছে ভেবে খুশী হ'ল। গর্বের হাসি হাসল। তারপর হাঁই বেঞ্চের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে কলমের ডগায় গীতার ব্লাউজ-নিম্ন অনাবৃত জায়গায় একটা খোঁচা দিল। গীতা আঁৎকে উঠে কপট রাগ দেখাল। ইতি উতি তাকিয়ে কেউ দেখে ফেলেছে কিনা যাচাই করল। কিছু একটা বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বলল না। ব্যাপারটায় দীপেন বেশ মজা পেল।

রথীন বলল, সিনেমায় যাবি শ্যামল?

—কী বই?

—ইংরেজি বই-এর নাম ঠিক মনে থাকে না। মেট্রোয় চলছে—এ ম্যান ফর কিলিং কিলিং কী যেন। সেদিন দেখলাম। টপ বই। আরেকবার দেখবো।

—আছে টাছে?

—দারুণ। একটা নেট প্রফিট সিন যা আছে না—ওতেই টিকিটের পুরো দাম উঠে যাবে।

—আজকাল হিন্দী সিনেমায়ও যা দিচ্ছে না। দীপেন জিগ্যেস করল, অরুন্ধতী দেখেছিস? ইউনিক। ডিরেকটারের সাহস আছে বলতে হবে।

—রিয়েলি। শ্যামল এবং রথীন কোরাস সমর্থন জানাল।

—তবু তো সেন্সর বোর্ডের লোকগুলো শালা মজা মেরে দেখে নেয় তারপর অনেক কিছু কেটে দেয়; নইলে যা থাকতো না। কথাটা বলে প্রবীর মুখ দিয়ে এমন একটা চুক চুক আওয়াজ করল যেন জিব দিয়ে রস চুষে চুষে খেল।

আলোচনাটা ক্রমশই গোলেমালি নিমক-এর মত স্বাদুকর হয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে থাকল। দুনিয়ার তাবৎ সিনেমার আলোচনা চলল। বিশেষত 'এ' মার্কা সিনেমা সংক্রান্ত; এবং কোন সিনেমায় কতটা নগ্নতা দেখিয়েছে—তাতেই সীমাবদ্ধ। নগ্নতার প্রসঙ্গে সমরান্তরে যৌন পত্রিকা এবং বিশেষ বিশেষ উপন্যাসের নামও এসে গেল।—এসব শুনতে শুনতে সে কেমন যেন বিমর্ষ বোধ করল। মনের ভিতরকার অসুখটা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠল। এমনিতেই আজ সকাল থেকে তার মেজাজটা ভাল না। মেঘলা আকাশ দেখে বুঝেছিল, দিনটা নির্ঘাৎ খারাপ যাবে।

সে কলেজ চত্বর ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, কোথায় যাওয়া যায়? কিছুতেই তেমন একটা যুতসই জায়গার নাম মনে এল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মেঘ কেটে যাচ্ছে। চারদিকে স্বচ্ছ আলো ফুটে উঠছে। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হবার লক্ষণ। সে উদ্‌ভ্রান্ত পা চালিয়ে অনির্দিষ্ট পথ চলতে থাকল। হাঁটতে হাঁটতে নিরিবিলি নদীর ধারে এল। একটা গাছের তলায় জন কয়েক হিপি হিপিনীকে বসে থাকতে দেখল। ওদের গলায় পুঁতির মালা। বৈদিক পোষাক। কপালে তিলক কাটা। সঙ্গে করতাল খঞ্জনি। নেশায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। ঢুলুঢুলু চোখ। সম্ভবত গাঁজায় দম দিয়েছে। ওরা নাকি একটা মেয়েকে দশজনে ভোগ করে। মেয়েটি নিষিধায় মা হয়। সে ভাবল, তাহ'লে হিপি কী মা হয়েছে? কখনো না। সেটাতো ওর প্রেস্টিজ। যে মা হতে চেয়েছিল—স্ত্রী হতে চেয়েছিল—যাকে সে মনে-প্রাণে ভালবাসত দরিদ্র ঘরের, সেই শান্ত সুন্দর মেয়ে শুভ্রার কথা তার মনে পড়ল। নিটোল দেহ। নিষ্পাপ চোখ মুখ। পবিত্র চাহনি ছিল শুভ্রার। ফিকে নীল রঙের শাড়ী ব্লাউজ পরলে দেখতে দারুণ ভাল লাগত। ওর দুরন্ত চুল অশান্ত হাওয়ার দোল খেত আর দোল খেত। উছলে পড়া হাসির রেশ যেন পাগল করে দিত। শুভ্রাকে তার দারুণ ভাল লাগত। সে মনেপ্রাণে শুভ্রাকে ভালবাসত। মনে মনে বিয়ে করার একটা গোপন স্বপ্নও দেখেছিল।

অথচ কিছুতেই কিছু হ'ল না। বাবা কেমন করে যেন তার গোপন ভাল লাগা ভালবাসা এবং ঘর বাঁধার ছোট্ট স্বপ্নটা জেনে ফেলেছিলেন। আবার সেই রক্তচক্ষু বিরক্তি এবং মেজাজ দেখিয়ে বললেন, ইম্‌পসিবল। ওসব এ্যাবসার্ড রোমান্টিকতা ছাড়। জলে তেলে কখনো মিশ খায় না। সময় হ'লে ভাল ঘরের উপযুক্ত মেয়ে দেখে বিয়ে দোব।

সুতরাং যে কারণে সে ছবি আঁকা ছেড়েছিল কবিতা লেখা ছেড়েছিল সেই একই কারণে ভালবাসাও ছাড়ল। পুরণো সেসব কথা ভাবতে ভাবতে সে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুক শূন্য করা মুঠো মুঠো দীর্ঘশ্বাস। পরাজয় ব্যর্থতায় গ্লানি ভরা দীর্ঘশ্বাস। তার কেবলি মনে হ'ল, হিপিরা নাকি গাড়ী বাড়ী ধন সম্পদের সুখ ভোগে বীতশ্রদ্ধ। ওরা সব বন্ধন ভেঙে প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশে বাধা-বন্ধনহীন ছুটে বেড়ায়। পাখপাখালি গাছগাছালি এবং অরণ্য সমুদ্র পর্বতময় ঘুরে বেড়ায়। উদ্দেশ্য—নিজেদের একাত্ম করে বিলিয়ে দেয়া। পরস্পর মিলেমিশে ভালবাসায় জড়িয়ে যাওয়া। ওদের বিশ্বাস—দয়া মায়া ভালবাসাই জীবনের সব। এই মুহূর্তে তার মনে হ'ল, সে তার বাবা মা দিদি কিংবা অন্য কোন আপনজনের স্নেহ প্রীতি ভালবাসা পায়নি। এসবের জন্য সে আজ বড়ই কাঙাল। শুভ্রা সংগ্রাম এবং সংগ্রামের মা তাকে সত্যিকার ভালবাসত। অথচ, আজ কতকাল হ'ল সে সংগ্রামদের বাড়ী যায় না। তাদের কোন খবর রাখে না। ভাবতে ভাবতে তার মনে অপরাধবোধ জাগ্রত হ'ল।

সন্ধ্যা উত্তরণে সে সংগ্রামদের বাড়ী গেল। তার বাড়ীর পিছন দিকে বিস্তর দূরে পাকা রাস্তার শেষ। সেখান থেকে রিফিউজি কলোনীর সুরু। সেই ধনী গরীব বসতির আলো আঁধারি প্রান্তদেশে বাবড়ি চুলের মত একঝাঁক পাতায় ভরা বড় একটা নিম গাছ। গাছটার ওপর সূর্য ওঠে—রোদ্দুর ছড়ায়। চাঁদ ওঠে—জ্যোৎস্না ছড়ায়। হাওয়া আসে—চিকন ডাল এবং পাতা দোলায়। গাছের নিচে দু'কাঠা জমির ওপর ছোট্ট দোচালা ঘর। টালির ছাদ। কারখানায় সাধারণ শ্রমিক সংগ্রামের বাবা অবসর সময় সামনের ঘরটায় ওয়েলডিং-এর কাজ করতেন। সংগ্রাম শ্রম এবং কর্মময় জীবনে বিশ্বাসী বলেই হয়ত ছেলের নাম রেখেছিলেন সংগ্রাম। আর এখন তার মৃত্যুর পর সংগ্রাম সেই ঘরটাতে প্রেস চালাচ্ছে। নাম দিয়েছে 'প্রত্যয়'। জব প্রিন্টিং কাজ হয়।

সাইন বোর্ডে, প্রোপ্রাইটার হিসেবে যদিচ সংগ্রামের বিধবা মা-র নাম লেখা। আসল মালিক সংগ্রাম নিজে।

সংগ্রাম নিজের পায়ে শব্দ তুলে মেশিন চালাচ্ছিল। ঘামে ভেজা তেলকালি মাখা অপরিচ্ছন্ন পোষাক। অবিন্যস্ত চুল। প্রশস্ত কপাল এবং নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। নিশ্চিত পরিশ্রান্ত। অথচ, চোখ দু'টো কী ভীষণ উজ্জ্বল। ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই। বরং মুখের আদলে পরম প্রশান্তির দ্যুতি। হাত এবং বুকের পেশী গর্বে স্ফীত। সংগ্রাম বেশ দক্ষতার সঙ্গে এক একটি সাদা কাগজ মেশিনে তুলে দিচ্ছিল। অপর হাতে ছাপা কাগজটা বের করে নিচ্ছিল। ছাপা শুকনো কাগজগুলো ওর মা একে একে গুছিয়ে রাখছিলেন। সে অনেকক্ষণ হ'ল দরজায় দাঁড়িয়েছিল। সংগ্রামের মা কাজের একাগ্রতায় তার উপস্থিতি লক্ষ্য করেননি। সংগ্রামই প্রথম তাকে দেখতে পেল। যারপরনাই বিস্মিত হ'ল। এক ঝলক মিষ্টি রোদ্দুরের মত উচ্ছ্বসিত হাসি ছড়িয়ে তাকে নীরব স্বাগত জানাল। তারপর মেশিন চালাতে চালাতেই বলল, একটু দাঁড়া। আর মাত্র কটা বাকি—এখুনি শেষ হয়ে যাবে। সংগ্রামের মা চোখ তুলে বললেন, কী ভাগ্য তুমি! কথাটা বলেই হাতের কাজ ফেলে উঠতে যাচ্ছিলেন। সে বাধা দিয়ে বলল ব্যস্ত হবেন না মাসীমা। হাতের কাজটা সেরে নিন —আমি বাইরে বসছি।

নিম গাছের নিচে চারটে বেতের চেয়ার। মাঝে ছোট্ট একটা গোল-টেবিল। সে একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। পরম প্রশান্তিতে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাল। আকাশ জুড়ে এত যে মেঘ ছিল—গেল কোথায়। সব উধাও। শরতের আকাশ। জ্যোৎস্না উঠেছে। নির্মেঘ অনাবৃত আকাশ জুড়ে জোনাকির মত অজস্র তারা। ইতস্তত ভেসে বেড়ানো শঙ্খশুভ্র টুকরো মেঘ। হিমেল শুকনা জড়ানো দিগন্ত। নিমগাছের পাতাগুলো হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। শিরশির আওয়াজ তুলছে। ঠিকরে পড়া জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে। সে নিষ্পলক চোখ চেয়ে দেখতে দেখতে উন্মনা হয়ে গেল। তার স্পষ্ট মনে পড়ছে, সংগ্রামের বাবা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে হঠাৎ একদিন কারখানায় মারা গেলেন। ঠিক কোন এ্যাক্সিডেন্ট নয়। অপরিপুষ্টিজনিত শারীরিক দুর্বলতা ছিল। সংগ্রাম তখনও রেঁস্তোরায় আড্ডা দিত। চা খেতে খেতে নিয়ত চাকরির জন্য এ্যাপ্লিকেশন লিখত। খামে ভরে মোড়ে বটগাছের নিচে ডাকবাক্সে ফেলে দিত। দারুণ ভাল ইংরেজি লিখত সংগ্রাম। নির্ভুল

এবং মুক্তোক্ষরে লেখা। বন্ধুমহলে অনেকেই বিশুদ্ধ ইংরেজি লিখতে পারত না। সংগ্রাম তাদেরকে এ্যাপ্লিকেশন লিখে দিত।

সংগ্রাম তার অপরিচ্ছন্ন পোষাক পরেই সামনের চেয়ারটাতে বসল। জিগ্যেস করল, হঠাৎ এতদিন পর তুই কী মনে করে?

সে বলল, এমনি। তুই যে প্রেস করেছিস জানতামই না। আজ সকালে শুনলাম। ছোট্কা বলল তাই—

—ওদিকে যাবার সময় পাইনা। দেখাও হয় না—জানবি কী করে। সংগ্রামের উত্তরটা কৈফিয়তের মত শোনাল। টুকটাক মামুলি কথা বিনিময় চলছিল। একসময় দু'জনেই নিশ্চুপ বসে থাকল। সংগ্রামই প্রথম কথা জুড়ল, কী করছিস এখন?

—কিচ্ছু না।

—দরকারই বা কী! বাপের অঢেল আছে।

কথাটা তার বুকে তীক্ষ্ণ সূঁচের মত বিঁধল। অসহ্য যন্ত্রণা। সোনার খাঁচায় বন্দী জীবনের যন্ত্রণা যে কত দুঃসহ—তা বোঝানো গেলে বোধহয় কিছুটা স্বস্তি পেত। অথচ, কোনো জবাবই তার মুখে এল না। সে প্রসঙ্গ পাল্টে জিগ্যেস করল. কেমন চলছে তোর প্রেস?

—ভালই। ফালতু খরচা নেই। নিজেই কম্পোজিটার প্রুফরীডার মেশিনম্যান—সবকিছু। তাছাড়া মা-ও প্রায় সব সময় কাছে থাকে– সাহায্য করে।

—ঘরের কাজ দেখে কে?

—সেটাও তো তুই জানিস না। বিয়ে করেছি। মা-র সঙ্গে আসবে—দেখবি'খন।

—এখানে? সে খুব আশ্চর্যবোধ করল। সংগ্রাম কিছুটা আত্মতৃপ্তির স্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ। এই খোলা আকাশের নিচে নিমগাছ। নিমগাছের নিচে বেতের চেয়ারগুলোই আমার বৈঠকখানা। ওরা দু'জন অনেক রাত্ত পর্যন্ত এখানে বসে থাকে। আমি ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে মেশিন চালাই।

সংগ্রামের মা এলেন। সঙ্গে সংগ্রামের স্ত্রী। হাতে জলখাবার। চারটে চেয়ার এখন পূর্ণ। খাবার খেতে খেতে টুকরো টুকরো কথা হচ্ছিল। হাল্কা মেজাজের কথা। আন্তরিকতা ভালবাসায় পরিপূর্ণ। অনেক কাছের আপন-

অনেকের সঙ্গে যেমন প্রাণখোলা কথা হয়, ঠিক তেমনি। কথার ফাঁকে সে কেবলই সংগ্রামের স্ত্রীকে দেখছিল। ঠিক যেন শুভ্রার মত দেখতে। তেমনি শান্ত সুন্দর নিষ্পাপ মুখচোখ। পবিত্র চাহনি। ঠোঁটের কোণে সলজ্জ আলতো হাসির ঝিলিক। দেখতে দেখতে তার বুকের ভিতরকার শূন্যতা যন্ত্রণা এবং গোপন অসুখটা প্রকট হয়ে উঠল। সে নতুন করে কোন কথা বলতে পারল না। সব কথা হঠাৎ কেমন যেন জমাট বেঁধে গেল। তার মনে হ'ল, সংগ্রামের সব আছে—সুখ শান্তি স্নেহ এবং ভালবাসা—সব। সে আর বসে থাকতে পারছিল না। হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বিশেষ প্রয়োজনে এখুনি বাড়ী ফেরার অজুহাত দিল। অনেকটা পথ সংগ্রাম তার সঙ্গে সঙ্গে এল। ফিরে যাবার আগে সংগ্রাম বলল, আবার আসিস—এলে খুশী হব। প্রত্যুত্তরে সে বলল, নিশ্চয়ই। আমিও তোর প্রত্যয় দেখে খুব খুশী হয়েছি। তুই নিশ্চিত আরো বড় হবি। সংগ্রাম সঙ্কোচের সঙ্গে অমায়িক হাসল। বলল, বড় বেশি কিছু ভাবি না। তবে আমি আশাবাদী। পাঁচটা পোস্টের জন্য যখন পঞ্চাশ হাজার এ্যাপ্লিকেশন পড়ত—তখনো আশা রাখতাম। বন্ধুরা ঠাট্টা করত। দেখলেই বলত, চাকরি হ'ল ? আমি বলতাম -হয়নি তবে হবে। ওরা বলত, অসম্ভব। সব ভাঁওতাবাজি। বাঁচার অধিকার মানুষ মাত্রেরই আছে। সেটুকু ছিনিয়ে নিতে হবে চলে আয় আমাদের দলে। আমি পারিনি।

সংগ্রাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল। সতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

এখন রাত্রি গভীর। কিছুতেই তার ঘুম আসছে না। ঘড়ির কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। অথচ তার হৃদস্পন্দন ক্লান্ত। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। কোথায় যেন অসুখ। গোপন কাঁটা বিঁধে আছে। কাঁটাটা নিরন্তর খুঁচিয়ে যাচ্ছে। বিব্রত করে। অবসাদ ক্লান্তি এবং বিষণ্ণতা। তার দুঃখবোধ এতবড় বাড়ীতে সে একান্ত একা। সংসারের জন্য তাকে কোন কাজ করতে হয় না। কোন চিন্তা ভাবনা নেই। বাঁচার জন্য সংগ্রাম লড়াই কিংবা কঠিন কোন সমস্যা উত্তরণ নেই। অথচ কোথায় যেন অসুখ। অনেক রাত পর্যন্ত দিদির ঘরে আলো। সাপের হিস হিস শব্দের মতো পুরুষ কণ্ঠ। পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বাবা চেকনাই জামাকাপড় পরে কলকাতায় গেছেন—রাত্তিরে বাড়ী ফেরেননি। কলকাতায় নাকি রক্ষিতা আছে। সোনার খাঁচায় বন্দী তার ধমনীতে পিতৃ-পিতামহের রক্তপ্রবাহ। অতীত—ঐতিহ্য এবং ট্রাডিশান। ট্রাডিশান

অর্থে গাড়ীবাড়ী অগাধ কালোটাকা। ভোগ বিলাস—মদ মাংস মেয়েছেলে।

এসব ভাবতে ভাবতে তার মনে হ'ল, দাঁড়াবার মত পা দু'টো দিনদিন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। বাবার ধনসম্পদ কালোটাকা যেন বগলে বসানো ক্রাচের মত। ক্রাচটা সরিয়ে নিলে কোনদিন বোধহয় আর নিজের পায়ে দাঁড়ানো যাবে না।

সুতরাং সে যন্ত্রণায় অস্থির। ঘর্মাক্ত; এবং ক্লান্ত। চারদিক নিস্তব্ধ নিথর। রাতের অন্ধকার এবং নিস্তব্ধতার বুক চিরে দূরে 'প্রত্যয়' নামে প্রেস থেকে মেসিন চলার অবিরাম শব্দ ভেসে আসে। সংগ্রাম বিনিদ্র কাজ করে। শব্দ তোলে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, প্রত্যাশিত ভোরের জন্য বাকি রাতটুকু আজ জেগেই থাকবে।

———

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

ওদের বাঁচতে দিন

আমরা হাঁটছি। আমি এবং আমরা। আমি অর্থাৎ একজন নিতান্ত শান্তশিষ্ট গোবেচারী মানুষ। এবং আমরা—অর্থাৎ আমার মত যারা। আমরা সবাই হাঁটছি। অনেকক্ষণ থেকে। অথচ আমরা কেউ নিশ্চয়ই ভাবিনি যে আমরা হাঁটবো। অন্ততঃ আমি তো ভাবিইনি। এসপ্ল্যানেডে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। ট্রামের দিকেও প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলাম। এবং আমার মত গোবেচারী যারা, যারা এখন সবাই হাঁটছে তারাও দাঁড়িয়েছিল, অথচ ট্রাম অথবা বাসের হাতলটি পর্য্যন্ত স্পর্শ করার আস্পর্দ্ধা আমাদের কারও ছিল না। কেননা মানুষে মানুষে ঠাসা এবং এই সব দেখে যখনই ভাবছিলাম ভীড়ের কারণটা কি হতে পারে তখনই ট্রাম এবং বাসের ভেতর এবং বাইরের ঝুলে থাকা মানুষগুলোর মধ্যে থেকে একটি স্লোগান—শুধু একটি স্লোগান আজকের খেলায় জিতলো কে? আমি দু'চোখে বিরক্তি নিয়ে ওদের দিকে তাকালাম। এবং তখনই ওরা সমস্বরে চিৎকার তুললো— ইস্টবেঙ্গল আবার কে? আমি সামনে পিছনে, এপাশে ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম, সবাই চাপা বিরক্তি নিয়ে আমার মত ভাবছে। আমি একটু দেরী করলাম। পেছনের আর একটা বাসের দিকে তাকাতে গিয়ে আবার শুনলাম—গোল দিয়েছে বলো কে? এবার আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আর একটা আওয়াজ শুনলাম—পরিমল দে আবার কে?

সর্বনাশ। আমার বুকের মধ্যে একটা কি রকম যেন ভয় ভয় করে উঠলো। কেন যেন আমার মনে হল ওরা আবার ক্ষেপেছে। এবং আমি তখন থেকেই হাঁটছি। তারপর থেকেই আমরা সবাই হাঁটছি। এবং তারপর থেকে আমি একবারও ট্রামে অথবা বাসে ওঠার কথা, ওদের গায়ে পা লাগানোর কথা ভাবিনি। আমি জানি এখন ওদের কিছুমাত্র অসুবিধা ঘটালে, ওদের কোন রকম প্রতিবন্ধকতার কারণ হলে ওরা আমাকে ঘুঁষি মারতে পারে।

নিদেন পক্ষে কিল চড়ও লাগাতে পারে। ছুরি অথবা রিভলভারের কথা ভাবতে পারি না। আমি ভীতু, নিরিবাদী এবং নিতান্ত শান্ত শিষ্ট মানুষ। আমি জানি, ওরা খেলার মরশুমে দেখা দেয়। তাই আমি কখনও এই মরশুমে ওদের মুখোমুখি আসি না। যদিও আজ এসে পড়েছি। আমি জানি ওরা পূজা পার্বনের সময় দেখা দেয়। আমি তখন নিতান্ত ভদ্রলোকের মত যখন যা চাঁদা চায় দিয়ে দিই। আর পাড়া বে-পাড়ার বকের কথা আমি মনে স্থান দিই না। আমি জানি, ওরা আমাকেই—এই যে হরিদাসবাবু, এই যে পাচুবাবু ইত্যাদি নামে ডাকে। আমি তখন এমন ভান করি যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। আমার তখন শুধুই মনে হয় ওরা ক্ষেপেছে। আমার বুকের মধ্যে ক্রমাগত ভয় জমতে থাকে। আমার পাশাপাশি কখনও কোনও যুবক হাঁটলে আমি বার বার চম্‌কে চম্‌কে উঠি। আমার তখন মনে হয় আমাকে ঠেলে দিলেই আমি পড়ে যাবো।

এখন আমি হাঁটছি। বেশ কিছুক্ষণ থেকে হাঁটছি। আমি এবং আমরা মুখ বন্ধ ক'রে চুপচাপ নিরীহ শিশুর মত হেঁটে চলেছি। মুখের ভাবখানা এমন রেখেছি যেন আমাদের মনের মধ্যে কোনও রাগ, কষ্ট অথবা বিরক্তি নেই। যেন আমরা খুব আনন্দে আছি। যেমন মুখ করে রেখেছে ঐ বাস ট্রামের কণ্ডাক্টররা। যদিও ওরা জানে যে, আজকের যাত্রীদের কাছ থেকে এক পয়সাও ভাড়া পাওয়া যাবে না। তবু মুখের ভাবখানা এমন করে রেখেছে যেন, এই সমস্ত ক্রীড়ামোদীদের এতদিন দেখা না পেয়ে ওদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। অথচ আমি জানি, আমার ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি থাকলেও মনের মধ্যে বিরক্তিটা ক্রমাগত জমছে। আমার কপালে যন্ত্রণা হচ্ছে। এবং এও জানি যে, এই যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। তবু আমি হাসি হাসি মুখে হাঁটবো। আমি চুপচাপ থাকবো. কেন না একটু সামান্ত শব্দ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। রাস্তা চলতে চলতেই এক ভদ্রলোক তাঁর পাশের ভদ্রলোককে ফিসফিসিয়ে বললেন—কি মুখার্জীবাবু, কেমন লাগছে? আমি খুব সন্তর্পণে ওদের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক এদিক ওদিক তাকিয়ে সযত্নে ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু বজায় রেখে চোয়াল দুটো শক্ত করলেন। তেমনি ফিস ফিস করেই বললেন, পরমাণবিক পরীক্ষা এত জায়গায় হচ্ছে, কিন্তু একবার কলকাতায় পরীক্ষাটা চালালে সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত। বেঁচে যেতাম মশাই। আমি চকিতে ওদের পাশ কাটাতে চাইলাম। কেননা

যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে আমি যেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত কেটে পড়তে পারি।

আরে ঘোষ, কি ব্যাপার রে?—আমার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ ক'রে উঠলো। কেননা আমার মনে হচ্ছে এই পথটা কোন রকমে শেষ ক'রে একবার ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারলে হয়। আমি চলার গতি বজায় রেখে পেছনে তাকালাম। আমাদের কলেজের বন্ধু বিকাশ। ও জোরে হেঁটে পাশে এলো। ওর মুখ, স্বচ্ছল পোষাক পরিচ্ছদ - সব কিছু খুঁটিয়ে দেখলাম। আমি আজকাল এমনই দেখি। কেননা কেউ ভালো আছে দেখলেই আমার হিংসা হয়। বা-রে, কতদিন পর দেখা বলতো। তুই তো মেখেও দেখলি না।—ও আমার পিঠে হাত রাখলো।—তারপর, কি করছিস বল?

আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম—চাকরী।

সে তো বুঝতেই পারছি। এই ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন এই সময়ে ঘর মুখো ছুটছিস তখন তো বুঝেছি চাকরী করছিস। কিন্তু চাকরীটা কি বলবি তো?

আমি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলাম। যদিও বিকাশ আমার কলেজের বন্ধু। যদিও ওর সঙ্গে আজ অনেকদিন পরে দেখা। তবু ঠিক এই মুহূর্তে ওর গলার শব্দকে পরিবেশের অনুকূল বলে মনে হচ্ছে না। তাই তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতেই সংক্ষেপে উত্তর দিলাম, সেই প্রথাগত কেরানীর চাকরী। বলতে পারিস পোস্টটা দাদার।

দাদার!—বিকাশ বিস্ময় প্রকাশ করলো।—অর্থাৎ!

আমি নিয়ম অনুসারে ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসলাম। অথবা একটা অব্যক্ত অভিব্যক্তি ফোটাতে চেষ্টা করলাম।—অর্থাৎ ইউনিয়নে ইউনিয়নে ঝগড়া বাধালো। স্ট্রাইক চললো। মালিক পক্ষ শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কড়া নোটিশ দিল এবং দাদা একটা গোটা পরিবারের জন্য চাকরী বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিল। এবং আমার চাকরীটা দাদার মৃত্যুর কমপেনসেশন বলতে পারিস।

এবার বিকাশ চুপ করলো। যেন কিছুক্ষণ চুপ রইল। আমি এবং আমরা ক্রমাগত হেঁটে চলেছি। যেন অনাদি অনন্তকাল ধরে হাঁটছি। যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরে হাঁটছি।

বিকাশ এবারে কথা বললো। যেন পরিবেশকে মেনে নিয়ে এবং পরিবেশের পরিপন্থী ফিস ফিস স্বরে—একদিন আয় না আমার বাড়ী। সোদপুরে একটা

বাড়ী করেছি বুঝলি ? তারপরেই যেন ভুলে গিয়েছিল এমন করে বললো—তোর ঠিকানাটা জোগাড় ক'রতে সেই সময় কত চেষ্টা ক'রেছি। তুইই শুধু এলি না।—অর্থাৎ বিকাশ বিয়ে করেছে।

এই বিকাশ। আমাদের কলেজের সহপাঠী সেই বিকাশ দত্ত। যে বই খুলে পরীক্ষা দিত। প্রায় সারা বছর আমরা তার প্রক্সি দিতাম। এবং যে প্রফেসরদের ভাষায় নীরেট গবেট ছিল। সেই বিকাশ বাড়ী করেছে। এবং বিয়ে করেছে। কোনদিন শুনবো গাড়ী করেছে। এবং এমনই হয়। আমি ভাবলাম এর সবটাই কি ভাগ্যের ব্যাপার ?

আমি এখন কারও সুখের কথা শুনলেই এই সব ভাবি। কেননা আমার জীবনে ফ্রাসট্রেশন এসেছে। কেননা আমার ক্রমশঃ বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আমারও বাঁচার একটা সুন্দর পরিকল্পনা ছিল। আমারও জীবনে কতকগুলো ফাইন সেন্টিমেন্ট ছিল।

কিরে কবে যাবি বল,—বিকাশ আবার কথা বললো।—মিত্রাকে তোর কথা কত বলেছি।

আমি বিমর্ষ মুখে ওর দিকে তাকালাম।—আসলে কি জানিস, আজকাল কোথাও যেতে খুব ভয় হয়। দেখছিস না। আজকাল কেমন খুন জখম হচ্ছে। এখন কোথাও যাবার কথা ভাবলেই গায়ে জ্বর আসে।

সেটা ঠিক, কিন্তু এসব যে বিনা কারণে হচ্ছেনা তা তুই অস্বীকার করতে পারবি না নিশ্চয়ই। ছেলেগুলো লেখাপড়া শিখে কি ক'রবে বল ! দেশের কি বিরাট শক্তি কীভাবে স্পয়েন্ড হচ্ছে বলতো। না আছে চাকরী, না আছে খেলাধুলা করার কোনও ব্যবস্থা। আমরা তবু চাকরী করছি কিন্তু এর পরের জেনারেশন কি করবে বলতো। কাজেই এ হওয়া উচিৎ ছিল, এ হবেই।

আমি জানিনা বিকাশ ওর অফিস ইউনিয়নের সেক্রেটারী কিনা অথবা ওর পাড়ার পলিটিক্যাল লীডার কিনা। কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারছি বিকাশ এবার মুখস্থ করা রাজনীতির বুলি আওড়াবে। আমার এসব ভাল লাগেনা। আমি চাকরি করি বলেই আমার সব সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং সমস্যা বেশী। এবং চাকরীটাই সব সমস্যার মূল কিনা আমি জানিনা। একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে যেন শুধু হুজুগ চলছে, অথবা আমি জানিনা। এমনও হতে পারে যে আমি গুছিয়ে ভাবতে পারি না, আমি আমার এবং আমার পরিবারের সমস্যা ছাড়া আর কারও সমস্যাকে সমস্যা বলে মনে করিনা।

আমি টুলুর জন্যে একটা চাকরী চাই। কিন্তু অন্য কারও চাকরীর ব্যাপারে মাথা ঘামাই না।

আমার আসল কথাটা মনে হতেই আমি ভূমিকা করলাম।—তুই এখন কি করছিস রে?

বিকাশ সচকিত হল। কেননা এই প্রথম ও নিজের কথা বলার সুযোগ পেলো। এর আগে যা বলেছে নিজে নিজেই বলেছে।

আমি এখন হিন্দুস্থান স্টীলে আছি। কাকা ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে। কাজেই চাকরীটা পেলাম। বলতে পারিস চাকরীটা আমাকে ডেকে নিল।—বিকাশ একটু হাসলো।—তারপর নিজের বরাতে নিজে করে খাচ্ছি।

বেশ আছিস তাই না?

তা মন্দ কি বল।—বিকাশ সলজ্জ হাসি হাসলো।—সবে প্রমোশন পেয়ে একজিকিউটিভ পোস্টে এসেছি।

আমি ম্লান হাসলাম তাহলে তো তোর গাড়ী করে ফেরা উচিৎ ছিল। তাই না। এবং আমাকেও একটা লিফ্‌ট দিতে পারতিস।

বিকাশ যেন একটু থতমত খেলো। নিজেকে চকিতে সামলে নিয়ে বললো বড় সাহেবের বাড়ীতে চা খাবার নেমন্তন্ন ছিল। এখন ওখান থেকে বেরিয়ে অবস্থা বুঝে হর্ণটন।

তোরা তো বেশ আছিস।—আমি আমার গলায় করুণ সুর ঢাললাম।—আমার ভাই টুলুকে একটা চাকরী করে দেনা। আমি একলা এই ভেঙে পড়া পরিবারটিকে নিয়ে কিছুতেই সামলে উঠতে পারছিনা।

বিকাশ এবার মাথা চুলকালো।—কিছুদিন আগেও যদি বলতিস, নিশ্চয়ই কিছু একটা করে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন চাকরীর যা দুরবস্থা তাতে কোনদিকে কিছু করার উপায় নেই রে। শালে কি আর ছেলেগুলো মারামারি কাটাকাটি করছে? চাকরীটা যেন এখন একটা স্বর্গের ফল, এবং ঐ ফলের লোভ দেখিয়ে এক এক জন কি ভাবে এক একদিকে লেলিয়ে দিচ্ছে বলতো!

আমি বিষণ্ণ চোখে একবার বিকাশকে দেখলাম। বিকাশও একবার চোখের পাশ দিয়ে আমাকে দেখলো। হাতের এ্যাটাচীটা খুলে দামী সিগারেট প্যাকেটটা বের করে নিজে একটা ধরালো। আমাকে দিতে এলে আমি রিফিউজ করলাম, আমার এখন ওর দেওয়া সিগারেট খেতে ইচ্ছে করলো না। বিকাশ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অভিজাত কায়দায় বললো—তোদের ভাইদের

বলনা বিপ্লব করতে। ওরা ভেঙেচুরে সব গুঁড়িয়ে দিক। দেশটাকে ভেঙে চুরে যদি নতুন ক'রে গড়তে পারে তাহলে একটা কাজের কাজ হবে।

বললাম, বিপ্লব তো তুইও করতে পারতিস।

তা পারতাম। কিন্তু সংসারের মধ্যে এমন জড়িয়ে গেছি যে জীবনটাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার কোনও উপায় নেই।—বিকাশ যেন একটু অস্বস্তির সঙ্গেই কথাগুলো বলে ঘড়ির দিকে তাকালো।—ঘোষ, আমার সাড়ে সাতটার গাড়ীটা ধরতে হবে। একটু জরুরী কাজ আছে। বিনয়ের সুরে বললো, আমি একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছি। ও এগিয়ে গেল।

আমি এবং আমরা এখনও হাঁটছি। ওরা এখনও চেঁচাচ্ছে। স্লোগান দিচ্ছে। বাস ও ট্রামের গায়ে থাপ্পড় মারছে। মেয়েদের দেখে সিটি দিচ্ছে এবং ওরাও যাচ্ছে। বিকাশ এইমাত্র বললো, কেননা ওরা চাকরী পাচ্ছে না। তাই ওরা বিদ্রোহ করছে। আমি দেখছি কয়েকটি তেরো চোদ্দ বছরের কিশোর ট্রামের জানালা ধরে ঝুলছে। এবং আর একটি ঐ বয়সেরই ছেলে ট্রামের গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে ছুটছে এবং সিগারেট টানছে। আমার মনে হল, আমরা বাঁচতে চাই। এবং বাঁচতে চাই বলেই চাকরী চাই। এবং চাকরী পেলেই আরও মাগ্‌গী ভাতা চাই, চিকিৎসা ভাতা চাই। কেননা মানুষের নানাবিধ সমস্যা। আমি যেন এখন কেমন গুছিয়ে চিন্তা ভাবনাগুলো সাজাতে পারছি। এবং এই সমস্যা ও সাজাতে পারার কথাগুলো মনে করতে গিয়েই আমার হাঁটার কষ্টের কথা মনে পড়লো। আমার ঘাড়ের শিরায় যন্ত্রণা অনুভব করলাম। এবং শেষে আমি একটি বিধ্বস্ত মানুষ বৈঠকখানা রোডে আমাদের প্রায় অন্ধকার ঘরের দরজায় এসে টোকা দিলাম। মা এসে দরজা খুললেন। এই সময়ে অর্থাৎ আমি অফিস থেকে ফিরলে মা কাছে কাছে থাকেন। কেননা এই সময়ে কারণে অকারণে আমি রেগে যাই। কোন কিছু অপছন্দ হলে জিনিষপত্র ছুঁড়ে ফেলি। এবং মা তার সামাল দেন। আমার মনে হয় আমি ওদের পরিত্রাতা বলে ওরা সবাই আমাকে একটু বেশী খাতির করে। আমার পয়সার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু ওরা চুষে চুষে খায়। এবং এবং ওরা বাঁচতে চায়। আমি এখন এসব কথা ভাবি। নিজেকে ভারবাহী গাধা বলে মনে হয়। নিজের জন্যে কিছু করতে পারলাম না বলে মনে মনে এই দৈন্য দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারটিকে দায়ী করি। কেননা আমার জীবনে ক্রাসট্রেশন এসেছে। আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। আমি জানি আমার

জীবনের সব রকম ফাইন সেন্টিমেন্টগুলো এখন আর বেঁচে নেই। আমি এখন এক মাসের মাইনে পেয়ে আর এক মাসের পয়লা তারিখের দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি দশটার অফিস গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি কখন পাঁচটা বাজবে বলে। মাসের শেষের দিকে হিসাব করি কি করে মাছটা বাদ দিয়ে বাজার করা যায়। এবং গমটা বাদ দিয়ে চালটা এবং চালটা বাদ দিয়ে গমটা রেশনে কি করে তোলা যায়। তবু আমি বাঁচতে চাই।

আমি খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর তাকালাম। ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র তছনছ করা দেখে আমি প্রায় ফেটে পড়তে গেলাম। সেই মুহূর্তে মা মুখ দিয়ে শুধু আওয়াজ করলেন—পুলিশ। আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। কেননা আমরা বাঁচতে চাই।

পুলিশ!—আমি খুব সন্তর্পণে প্রায় চোখ দিয়েই শব্দটাকে প্রকাশ করতে চাইলাম। মা দরজা বন্ধ করলেন, ফ্যাকাসে চোখ দুটো তুলে বললেন—টুলু কি করছে না করছে জানিনা। তাই পুলিশ। অর্থাৎ বিকাশের ভাষায় বিপ্লব করতে চাইছে। কেননা টুলুও ওর নিজের মত করে বাঁচতে চায়। এবং আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে টুলুকে সামনে পেলে আমি ওর টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলবো। কেননা আমিও আমার মত করে বাঁচতে চাই।

মাকে বললাম, টুলু এলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোল।

আমি এখন রাত্রের খাওয়া শেষ করে বিছানায় গা এলিয়ে আধ শোওয়া অবস্থায় আছি। টুলু এখনও আসেনি, টুলুর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার। আমি জানিনা আমি কি বলবো। অন্ততঃ ওকে বাঁচার কথা বলতে পারবো। তাই আমি ভাবছি। ভাবছি টুলুর কথা। ভাবছি আমার কথা, ভাবছি আমাদের কথা। আমি হয়তো টুলুকে অনেকদিন দেখিনি। ঠিক দেখার মত দেখিনি। অথচ আগে দেখেছি। যখন আমরা ছোটবেলায় জিনিষ নিয়ে মারামারি করতাম তখন, যখন খাবার থালা সামনে রেখে মাছের টুকরো নিয়ে ঝগড়া করতাম তখন। আবার কখনও কখনও একই জিনিষ যখন ভাগ করে খেতাম, তখন। এখন একই ফ্ল্যাটের পাশাপাশি দুটি ঘরের মধ্যে আমাদের জীবন। আমাদের চলতে ফিরতে গায়ে গা লাগে। তবু আমি টুলুকে দেখিনি।

আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। এবং আমরা সবাই বাচতে চাই। টুলুও বাচতে চেয়েছিল। এবং সেই জন্যেই ও কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়েছিল। ওর পরিকল্পনা ছিল ও রিসার্চ করবে। টুলু এখনও বাঁচতে চায় নিশ্চয়ই। তাই ও বিপ্লব করছে। বিকাশ বলছিল, ওরা লেখাপড়া শিখেছে। টুলু ব্রিলিয়েন্ট ছাত্র। কিন্তু চাকরী পাচ্ছে না। ওরা খেলতে ভালবাসে। কিন্তু খেলার মাঠ পাচ্ছে না। অথচ বিকাশরা বাড়ী করে। এবং বিকাশরা বিয়ে করে।

—দাদা।

আমি প্রায় চমকে উঠলাম। আমি আর্তনাদ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। কেননা আমি দেখলাম টুলু এসেছে। আমি সোজা হয়ে বসলাম। এখন আমার কিছু বলতে হবে। কিন্তু প্রথম কথাটাকে আমি কিছুতেই ঠিকমত ধরতে পারছি না যা দিয়ে আমি আমার বক্তব্যটা আরম্ভ করতে পারি।

তুমি আমাকে ডেকেছ?—টুলুর গলার আওয়াজ খুব গম্ভীর। আমার পরিষ্কার মনে পড়লো, ওর গলার আওয়াজ আমি অনেকদিন পর শুনলাম। বোধহয় শুনতে চাইনি। কেননা এখন আমার মনে হয় ওদের জন্যে আমার কিছু হল না। টুলুর চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। আমি ওর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম। আমার মনে হল এখন আমি ওর দিকে তাকালে আমি আমার ভাবনা-চিন্তা এবং কথাগুলো হারিয়ে ফেলতে পারি। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারি।

টুলু আমার থমকে থাকা চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসলো। কেমন ব্যঙ্গ করা হাসি মাখিয়েই বললো—তুমি আমায় কি বলবে জানি। আমি আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও কি জানে? আমি ভাবলাম, টুলু কি হঠাৎ ঈশ্বর হয়ে গেল?

টুলুর চোখের দৃষ্টি শক্ত হল। ও খুব সহজ ভাষায় বললো—আমি তোমাদের কোনও পুরণো কথা শুনতে চাই না। আমি জানি তুমি বলবে বাঁচার কথা, তুমি বলবে আমাদের পরিবারের কথা। তুমি বলবে চাকরীর কথা। আমি যেন অতি সুবোধ বালকের মত মাথা দোলালাম।—ঠিক তাই। কিন্তু তোমরা কি কিছু নতুন কথা শোনাতে পারো না? যা শুনলে আমাদের ভাল লাগবে।

টুলু আমার চেয়েও বছর ছয় সাতের ছোট। সেই টুলু আমার দিকে সোজা তাকিয়ে নতুন কথা শোনাতে বলছে। আমি এবার সত্যি সত্যিই ওর

পেলাম। এখন ওকে আমার অচেনা মনে হচ্ছে। তবু ঢোক গিলে আমি বললাম—নতুন কথা তোদের নেতারা নিশ্চয়ই শোনাবে। কিন্তু আমরা তো তোকে বাঁচার কথাই বলবো। বাঁচাবার কথাও বলবো। এবং একটা চাকরী বাকরী—অন্ততঃ রিসার্চটাও তো করতে পারতিস।

টুলু হাঃ হাঃ শব্দে হাসলো।—

হাসি মিশিয়েই উত্তর দিল. এই কথাগুলো কেমন সুন্দর ট্র্যাডিশনাল। বাবা বলতেন বড়দা ইঞ্জিনীয়ার হবে। অথচ সেই বড়দাকে সামান্ত কেরানীর চাকরী বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিতে হল। তুমিও ছিলে ব্রিলিয়েন্ট স্কলার। তোমার সময়েও সেই ট্র্যাডিশনাল কথাটাই সকলে বলেছিল। অর্থাৎ তুমি হবে ডাক্তার। এবং সেই তুমি বড়দার মৃত্যুর অনুকম্পা অথবা করুণার ফলটি ভোগ করছো। এবং সব শেষে আমি!—টুলু এবার বিকৃত হাসলো। আমাদের মত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পরিবার শুধু স্বপ্নই দেখে চলেছে। জন্ম জন্ম ধরে। বংশ পরম্পরায়। কেননা এই হচ্ছে আমাদের দেশের কাঠামো।

আমি রাজনীতি বুঝি না। আমি আমার পরিবারের বাইরে আর কারও কথা ভাবি না। ভাবতাম কিনা জানি না। কিন্তু এখন ভাবি না। আমি বিনীত স্বরে বললাম—টুলু, তোকে আমাকে যে বাঁচতে হবে রে।

সেই জন্তেই তো আমাদের সংগ্রাম। বাঁচতে গেলেই লড়তে হবে। এবং লড়তে গেলেই মরতে হবে।

বাইরের দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হলো। টুলু অন্যমনস্ক হল। দরজার দিকে ফিরে তাকালো। হাঁটতে উদ্যোগ করতে করতেই বললো—তুমি যেহেতু চাকরী করছো সেই জন্তে তুমি অন্য ভাবে বাঁচার কথা ভাবছো।

টুলু চলে গেল। এবং আমি অনেকক্ষণ ঘরের চার দেওয়ালে শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি এখন বাস থেকে নেমে অফিস যাচ্ছি। এ পথটুকু আমাকে হাঁটতে হয়। আমরা সবাই হাঁটছি। হঠাৎ আমরা থমকে দাঁড়ালাম। সামনে দশ পনেরো জন যুবক একটি তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেকে মারছে। একটা মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলো এ গলি সে গলিতে ঢুকে পড়লো। পাশাপাশি বাড়ী এবং দোকান-পাটের জানলা দরজা ঝটাপট বন্ধ হয়ে গেল। আমি কি করবো ভাবছি। পাশ দিয়ে এক ঠেলাওয়ালাকে তৎপর হয়ে যেতে

দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে ভাই? ও শুধু বললো, পালিয়ে যান বাবু। ও সব পাগল আছে। অর্থাৎ ওরা পাগল এবং আমাকে পালাতে হবে। কেন না আমরা বাঁচতে চাই। আমি পেছন ফিরলাম। ঠিক সেই সময়েই একটি করুণ কচি গলার আওয়াজ শুনলাম, আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান। আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম, ছোট ছেলেটির ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। রক্ত, লাল রক্ত। আমি একবার পালাবার চেষ্টা করেও পারলাম না। আমার মনে হল, এ হওয়া উচিৎ নয়। এ হতে দেওয়া উচিৎ নয়। কেননা, আমরা সবাই বাঁচতে চাই। হাজার সমস্যা, যন্ত্রণা, ক্ষুধা তৃষ্ণা—এ সবের মধ্যেও আমরা বাঁচতে চাই। আমি আমার নিঃশ্বাসে উত্তাপ অনুভব করলাম। আমার সেই উনিশ কুড়ি বছরের তরুণ মনটিকে হঠাৎ যেন ফিরে পেলাম। অনেকদিন পর আমি আজ নতুন করে বুঝলাম, আমার মানবিকতা বোধ আজও আছে। এবং আমি আমাদের পরিবারের কথা ছাড়াও অন্যের কথাও ভাবি।

আমি ছুটে ওদের মধ্যে ঢুকে গেলাম। ছোট ছেলেটিকে হাত ধরে টেনে এক পাশে সরিয়ে আনলাম। ওরা প্রথমটা বিস্ময়ে থমকে গেল। আমি যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের মুখগুলো একে একে দেখছি ঠিক তখনই আমার বাঁ দিকের চোয়ালের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘুঁষি এসে পড়লো। আমি ঠোঁটের কোণে জিব চেটে নোনা স্বাদ পেলাম। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। এক রাশ ধোঁয়া উড়লো। আমি হারিয়ে যেতে থাকলাম। আমি হারিয়ে যেতে যেতে মাকে দেখলাম। বাবা এবং দাদা মারা যাবার দিনগুলির করুণ বিষণ্ণতা অনুভব করলাম। বৌদিকে দেখলাম। টুলু ছুটছে। ওর হাতে কি যেন রয়েছে। আমি জানিনা ওগুলো বোমা কিনা। আমি পরিষ্কার দেখলাম, হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি টুলু ছুটছে। ওরা ছুটছে। আমি অস্থির অসহ্য যন্ত্রণার ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে হারিয়ে যেতে যেতে কোথায় যেন তলিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলতে চাইলাম, ওকে বাঁচান, ওদের আপনারা বাঁচান।

সুবোধ ভৌমিক

একদিনের গল্প

বেলা করে ঘুম ভাঙতেই সুরজিৎ-এর মনে পড়লো আজ সকালে শুভ্রাকে নিয়ে তার ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার কথা। বারান্দায় বসে শুভ্রা জনতা ধরিয়ে চায়ের জল গরম করছিল, ঘরের গোলাপী রঙের পর্দার ফাঁক দিয়ে সুরজিৎ শুভ্রার ভেজা চুল আর টেরিকটের শাড়িটা দেখতে পেল। অতএব, সুরজিৎ বিছানায় আলস্য ভাঙতে ভাঙতে বুঝে নিল, ডাক্তারখানায় যাবে বলে শুভ্রা ইতিমধ্যেই নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে।

এখন আস্তে আস্তে মনে পড়ছিল সুরজিৎ-এর। যেন হারানো স্বপ্নের কোন সূত্র, যা স্মৃতি কুরে কুরে বার করতে হয়। কাল রাত, ঠিক রাত না মধ্যরাত বোঝা যায় না, চারিদিকে গা ছমছম করা অন্ধকার সেই অন্ধকারের মধ্যে খেলাটা শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার একটা ঢেলা শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে অসাড় করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় না, আরো একটু পরে, যখন সুরজিৎ-এর গোটা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, ঠিক তখনই হয়তো শুভ্রার ঘুম ভেঙে গিয়ে থাকবে। শুভ্রা নিজে নিজেই জেগেছিল কিংবা সুরজিৎ-এর ছটফটানিতে জেগে উঠেছে সে কথা শুভ্রা বলেনি।

শুভ্রা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরের আলো জেলে দিয়েছিল। সেই আলোয় যন্ত্রণার মধ্যে শুভ্রার ভীত চোখ, স্ফীত নাক আর শঙ্খের মতো কঠিন স্তন একই সঙ্গে নজরে এসেছিল সুরজিৎ-এর। শুভ্রা মিনিট খানেক সুরজিৎকে লক্ষ্য করে যেন বুঝে নিতে চাইছিল ব্যাপারটা। ওর দু'চোখে কৌতূহল আর উদ্বেগ প্রায় সমানভাবে দুলছিল। সুরজিৎই প্রথম কথা বলল, আমি একটু জল খাব!

নিজের কানেই গলাটা কেমন ঘরা ঘরা শোনালো। যেন এটা তার গলা নয়। শুভ্রা আঁচল দিয়ে প্রথমে সুরজিৎ-এর ঠোঁট, নাক আর চিবুক থেকে ঘাম মুছে দিল। শুভ্রার ভ্রু কুঁচকে আছে, অতএব সুরজিৎ বুঝল, আমাকে

ঘিরে শুভ্রার মনে এখনো উদ্বেগ দুলছে। এরকম অবস্থায় ঠিক কতক্ষণ কেটেছে এখন তা আর সঠিক মনে করতে পারছেনা সুরজিৎ। মিনিট পাঁচেক কিংবা একঘণ্টা যাই হোক না কেন ঐ ঘনঘন পরিবেশটা হালকা হয়েছিল ঠিক কিভাবে সে কথাটা মনে করতে চাইল সুরজিৎ। সব ঠিক ঠিক মনে আসছিল না, আসবার কথাও নয়। কেননা, তার মাথার ভেতরটা এখনো খুব পরিষ্কার মনে হচ্ছিল না, ঘোঁয়াশা বলতে যা বোঝায়, সেই রকম একটা কিছু তার মাথার মধ্যে জমে আছে।

শুভ্রা চা নিয়ে এলো। কাঠের গোল টেবিলটা অদূরে ছিল, শুভ্রা সেটা টেনে সামনে আনল। চায়ের পেয়ালা সুরজিৎ-এর হাতে তুলে দিতে দিতে সকালের রোদের মত হাসল। সুরজিৎ চায়ের পেয়ালা নিয়ে প্রথমবার চুমুক দিয়ে থাবার আগে শুভ্রা বলল, তুমি চা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। দেরী করলে ডাক্তারকে চেম্বারে পাওয়া যাবে না।

ঠিক আদেশের ভঙ্গিতে না বললেও শুভ্রার বলার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব থেকে থাকবে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই সুরজিৎ-এর মনে হল, কাল রাতের ঘটনার পর আমার সম্পর্কে শুভ্রা খুব সতর্ক হয়ে গেছে। এখন এবং পারলে এই মুহূর্তেই সে ব্যাপারটার মীমাংসা করে ফেলতে চায়। শুভ্রার এই চাওয়াটা এত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ যে, সুরজিৎ-এর বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না।

সুরজিৎ বিছানা ছাড়তে ছাড়তে দেখল ঘড়িতে এখন আটটা বেজে গেছে। রবিবারের সকাল বলে চারপাশে এখনো একটা গা-ছাড়া ভাব। একমাত্র শুভ্রাই আজকের সকালে একমাত্র ব্যতিক্রম, যেহেতু তাকেই আজ এই মুহূর্তে সবচেয়ে ব্যস্ত মনে হচ্ছে।

সুরজিৎ অন্ধকার রাতগুলোর কথা আর ভাবছিল না। সে জানে এখন অনেক চেষ্টা করেও সেই অন্ধকার স্মৃতি থেকে বেশি কিছু সে উদ্ধার করতে পারবে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎ হালকা হতে থাকবে এবং তার মন আস্তে আস্তে গতরাত্রের সমুদয় স্মৃতিকে জলের তলায় ডুবিয়ে দেওয়ার মত মনের কোথাও তলিয়ে দেবে। আবার অন্ধকার থেকে ওরা ভেসে উঠবে রাত বাড়লে। রাত মানে যখন দিনের শেষ চিহ্ন মুছে গিয়ে বাদুড়ের ডানার মতো একটা ভারী অন্ধকার চারপাশে দুলতে থাকবে, যখন কাছে এবং দূরে অবিরত ঝিঁঝিঁর ডাক, নারকেল গাছের পাতার মধ্যে হাওয়ার গোপন যাতায়াত আর.....

আর ঠিক মনে আসছে না। রাতের চরিত্র দিনে ঠিক ঠিক মনে করতে পারেনা সুরজিৎ। অতএব, অনর্থক চেষ্টা না করে সে উঠে দাঁড়াল, পাজামার দড়ি শক্ত করে বেঁধে নিয়ে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এল।

সুরজিৎ রাতের জামা বদলে নিয়ে নতুন প্যান্টের সঙ্গে ফিকে হলুদ রঙের বুশ শার্ট পরে নিল। পরিপাটি করে চুল আঁচড়াতে গিয়ে আরো কয়েকটা সাদা চুল নজরে এল তার। অন্যদিন হলে ব্যাপারটা নিয়ে শুভ্রার সঙ্গে খানিক রসিকতা করা যেত। নিজের পাকা চুল দেখিয়ে সখেদে বলতো সুরজিৎ, দেখ বিয়ে করবার পর কত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

ঠোঁটে হাসি চেপে শুভ্রা বলতো, হয়ে যাচ্ছো না, হয়েই ছিলে।

—মানে ?

চাপা হাসি ঠোঁটের কানায় কানায় ছড়িয়ে দিয়ে বলতো, বয়েস লুকিয়ে বিয়ে করেছো তা কি আর বুঝিনা বলতে চাও।

এই ধরণের একটা ছদ্ম ঝগড়া অন্যদিন হলে করা যেত। আজ সেরকম কোন উৎসাহ ছিল না সুরজিৎ-এর। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল তার শরীরে এখনো বিস্তর আলস্য জড়িয়ে আছে। স্নায়ুগুলো পর্যন্ত শিথিল হয়ে যাচ্ছে, শরীরের মধ্যে সার নেই যেন।

কেন এরকম হয় ? সোফায় বসে কাগজ দেখতে দেখতে নিজের মনের মধ্যে প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করল খানিক। খোলা দরজা দিয়ে সে উদাস চোখে তাকিয়ে রইল। বারান্দায় এবং উঠোনে তখন যা যা ঘটছিল, যেমন শুভ্রার রুটি সেঁকা, মিত্র-গিন্নীর উঠোনে দাঁড়িয়ে দুধওলার সঙ্গে কথা, ছেলে দুটোর লাটাইয়ে সুতো জড়ানো, এগুলো কিন্তু তার চোখে পড়ছিল না। যেন ঘোর লাগা চোখে সে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে সুরজিৎ-এর চোখে এই রকম ঘোর লেগে যায়।

শুভ্রার ডাকে চমক ভাঙে তার। খাবারের প্লেটটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে শুভ্রা বলল, তুমি এই পরে যাবে নাকি। সুরজিৎ অবাক হয় ক্ষতি কী ? ডাক্তার খানায় যাওয়া মানে তো শ্বশুরবাড়ী যাওয়া নয়।

মুখে বিরক্তি ফোটে শুভ্রার, মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ফাজলামো করো না। তুমি খেয়েই পোষাকটা বদলে নেবে, খুব চটপট।

শুভ্রার এই ব্যস্ততা ক্ষণে ক্ষণে সুরজিৎকে স্বতন্ত্রতার এবং আরো

অনেকরাত্রের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। সুরজিৎ-এর সমস্ত স্নায়ু যেন আস্তে আস্তে গরম হয়ে ওঠে, সে টের পায় তার মাথার মধ্যেকার রক্তবাহী শিরা উপশিরাগুলি ক্রমশ ফুলে উঠছে। বুকের নিঃশ্বাস ভারি। চোখের সামনে রাত্রের ছবি, যে ছবিতে সুরজিৎ নিজেকে দেখে ভিন্ন চেহারায়। জোনাকির আলোর মতো এই কষ্টদায়ক বোধটা সুরজিৎ-এর মনে জ্বলে উঠেই নিভে যায়, দিনের বেলা এই বোধটা বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না।

ডাক্তারখানায় এসে সুরজিৎ আরো বুঝল, সে তার কষ্টটাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারেনা। বলতে গিয়ে দেখে, একটি উপযুক্ত শব্দ তার মনে পড়ছেনা, যেন ঐ শব্দটা কিছুতেই মনে আসে না, যা দিয়ে নিজের কষ্টটাকে যথাযথ বোঝানো যায়। যেন একটি সার্থক শব্দ নির্বাচনের অভাবের জন্যই তার সমুদয় কষ্ট আর লাঘবনা দুর্বোধ্য থেকে যাচ্ছে। অতএব, ডাক্তারের মুখোমুখি সুরজিৎ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বলে, মাঝে মাঝে আমার কষ্ট হয়, ঘুম থাকে না, শ্বাসকষ্ট জাতীয় একটা কষ্ট, মাথার মধ্যে কী রকম ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

ডাক্তার চোখের চশমা খুলে নিয়ে আবার চোখে পরতে পরতে খুব মনোযোগ দিয়ে সুরজিৎকে লক্ষ্য করে। সুরজিৎ অনুভব করতে পারে, ডাক্তারের দৃষ্টি তার মুখের ওপর একটা মাছির মতো বিড়বিড় করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো কখনো সেই দৃষ্টি কয়েক মুহূর্তের জন্যে এঁটে যাচ্ছে সুরজিৎ-এর চোখের ওপর। কিন্তু সুরজিৎ তো কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারছেনা, আর পারছে না বলেই কী ডাক্তারের বিচক্ষণ দৃষ্টি তার মুখের ওপর মাছির মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে? আসলে সত্যিকারের কষ্ট কী কাউকে বুঝিয়ে বলায়? সুরজিৎ অসহায় ভঙ্গিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল।

ডাক্তার ততক্ষণে সুরজিৎ-এর নাড়ি টিপে ধরেছে। শুশ্রূষা অভিভাবকের গলায় বলছিল, রাতের দিকে একদম ঘুম থাকেনা। কখনো সখনো একটা তন্দ্রার ঘোরে শুয়ে থাকে, আসলে সেটা ঘুম নয়। ঐ সময় কি সব বিড় বিড় করে বলে ঠিক বোঝা যায় না।

সুরজিৎ ডাক্তারের মুখোমুখি বসে ঘামতে শুরু করে। শুশ্রূষার কথাগুলো বরফের টুকরো হয়ে যেন তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সুরজিৎ নিজেকে এখন ভীষণ অসহায় ভাবল। মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে পাখা ঘুরছিল, অথচ মুখটা ঘেমে যাচ্ছে সুরজিৎ-এর। পাখার একটানা শব্দটা যেন কয়েকটা ক্রুদ্ধ বোলতার চিৎকার—যা কেবলই সুরজিৎ-এর কানের ওপর আছড়ে পড়ছে।

মুখটা ক্রমশ ঘামতে থাকায় সুরজিৎ এর পকেট থেকে রুমাল বার করবার কথা মনে হলেও কার্যত তা পারল না। কারণ, তার হাতটা এখনো ডাক্তারবাবু ধরে আছে, আর রুমালটা তার পকেটেই।

শুভ্রা আরো কিছু বিবরণ ডাক্তারকে দিচ্ছিল। সব কথা ভালো করে যেন শুনতেও পাচ্ছেনা সুরজিৎ। পঞ্চাশ বছরের ব্যাচিলর ডাক্তার আর শুভ্রার কথোপকথন যেন গোপন শলা পরামর্শের মতো মনে হচ্ছে। সুরজিৎ চুরি করে ওদের দুজনকে দেখল। ডাক্তারের চোখ এখন শুভ্রার মুখের ওপর। ওদের কথা চলছে নিচু গলায়। যেন সুরজিৎ-এর কান বাঁচিয়ে ওরা কিছু আলোচনা করে নিচ্ছে। সুরজিৎ নিঃস্পৃহের মতো ডাক্তারের চকচকে টাকের ওপর দিয়ে পেছনের জানালা এবং জানালার ওপারে অনেক দূরে শূন্যে তাকিয়ে থাকল।

ঠিক কতক্ষণ পর ওদের আলোচনা শেষ হয়েছে, কখন ওরা ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি এসেছে, আর কখনই বা শুভ্রা এতসব রান্না শেষ করেছে এখন খেতে বসে সেসব আর মনে করতে পারল না সুরজিৎ। ইদানিং সে লক্ষ্য করেছে তার হামেশাই এরকম হচ্ছে। মাথার মধ্যে কোন চিন্তার সূত্রগুলোকেই সে আর ধরে রাখতে পারেনা। খেতে বসে সে এইসব কথা ভাবছিল। শুভ্রা হঠাৎ বলল, আজ বিকেলে তো কোন কাজ নেই। চলনা সিনেমায় যাই।

ভাত মাখতে মাখতে অন্যমনস্কের মতো জবাব দিল সুরজিৎ, ভালো ছবি না থাকলে সিনেমা ভালো লাগে না। আড়াই ঘণ্টা কালচু নষ্ট হবে।

—তবে চল বেড়াতে যাই কোথাও। যাবে?

—কোথায়?

শুভ্রা ভাতের গ্রাস মুখে তুলেছিল, নামিয়ে দিয়ে বলল, যেখানে হোক।

—আমার কোন পছন্দ নেই, তুমি বল।

শুভ্রার চোখের তারায় খুশীর ঝিলিক। শুভ্রা সুরজিৎ-এর চোখে তাকিয়ে হেসে ফেলল, তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব করে সে বলল, এই এক জায়গায় যাবে?

—কোথায়? না তাকিয়ে প্রশ্ন করে সুরজিৎ।

—বিয়ের আগে যেখানে যেতাম। যেখানে প্রথম আমাদের বিয়ের কথা—

শুভ্রাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুরজিৎ নরম গলায় বলে, পার্কে !
দুই চোখের পাতা নামিয়ে নিঃশব্দে শুভ্রা বলে, হ্যাঁ।

পার্কে এসে অব্দি সুরজিৎ অনেকক্ষণ জলের দিকে চোখ নামিয়ে বসে রইল। তার চারপাশে অবসন্ন বিকেল ঘন হয়ে উঠছিল। জলে ছায়া ফেলে এক ঝাঁক বক দক্ষিণ থেকে উত্তরে উড়ে গেল। ঝিলের জল দুধের স্বপ্নের মতো ভারি এবং স্থির, কেবল দক্ষিণের দমকা বাতাসে ওপর ওপর একটু কেঁপে যাচ্ছে।

সুরজিৎ খানিক আগে ঝিলের জলে পা ডুবিয়েছিল, শুভ্রা নিষেধ করায় পা তুলে নিয়েছে। জলফড়িং জাতীয় কয়েকটা জলপোকার দিকে অর্থহীন কৌতূহলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুরজিৎ এখন জলের ওপর চোখ নামিয়ে এনেছে। জলের দর্পণে ওদের ছায়াদুটো। শুভ্রা অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে বসে, সুরজিৎ সামনের দিকে পা দুটো ছড়িয়ে—দুটো মূর্তি যেন প্রাচীন কোন পটের মতো, অন্ততঃ জলের দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয়। সুরজিৎ জলের ভেতর শুভ্রাকে দেখল। শুভ্রা নিচু হয়ে কাপড়ের পাড় থেকে চোরকাঁটা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। ঘাড়ের ওপর শিথিল খোপা, গলায় সরু হারের চেনটার পাশে চিকচিক করছে ঘাম।

আস্তে আস্তে চোখ ফেরায় সুরজিৎ। তার চোখের ওপরেই পার্কে বিকেলের আলো সরে আসতে থাকে। ঝিলের ঝোপে জঙ্গলে গোধূলির ক্লান্ত ছায়া। দিনের আলো ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুরজিৎ টের পায় তার মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার খেলাটা আরম্ভ হচ্ছে। আর একটু পরে অর্থাৎ অন্ধকার আরো বাড়লে সুরজিৎ-এর গোটা বুক জুড়ে থই থই করবে একটি যন্ত্রণা। ভাষাহীন, উত্তাপহীন সেই অনুভূতি সুরজিৎ-এর শরীরকে যেন মুহূর্তেই একটা সাপের উদ্যত ফণার নিচে এনে বসিয়ে দেয়। তখন, সেইসব মুহূর্তে শুভ্রা কি ভাবে ?

সুরজিৎ জানে না, এটা আদৌ কোন অসুখ কিনা। কিংবা মানসিক কোন ব্যাধি-ট্যাধি। কবে, কিভাবে তার মধ্যে এই অসুখ ঢুকেছে তা সে মনে করতে পারে না। এতদিন আপ্রাণ চেষ্টায় শুভ্রার কাছ থেকে সে নিজেকে শুধু গোপন করতে চেয়েছে। যেহেতু, শুভ্রার কাছে এই অসুখটার ব্যাখ্যা কী হতে পারে সে সম্পর্কে সুরজিৎ-এর মনে সংশয় ছিল। তার মনে হয়েছিল, শুভ্রা হয়তো

তাকে নিয়ে জীবন অসহায় বোধ করবে, রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে হামেশা বিব্রত হবে। সুরজিৎ শুভ্রার এরকম বিব্রত হওয়ার ছবিও মনে মনে কল্পনা করেছে অনেকদিন।

শুভ্রার দুই চোখ ভরা শাসন। ঠোঁট দুটো খুশিতে ছোপানো। সুরজিৎ-এর কোনই অসুবিধে নেই এই মেয়ের ঠোঁটে কপালে চোখের পাতায় তার ঠোঁট ছোঁয়াতে।

তবুও এই শুভ্রাকেই বলা যাচ্ছে না অসুখটার কথা। সুরজিৎ-এর মনে শুভ্রার স্মৃতি আলোর শিখার মতো কাঁপতে থাকে। শুভ্রা কী ভাবে? সুরজিৎ-এর মন যেন ফিসফিস করে আবার জিজ্ঞাসা করে, শুভ্রা কী ভাবে?

—এই তোমার কি হয়েছে বলতো? হঠাৎ হঠাৎ এরকম গম্ভীর হয়ে যাও কেন?

—তাই বুঝি।

—বিশ্বাস না হয় আয়না দিয়ে দেখলেই পারো। বিয়ের পর লোকের চেহারা ভালো হয়, আর তোমার দিনদিন একি হচ্ছে?

সুরজিৎ শুভ্রার চোখে চোখ রাখে। চোখে চোখে নিরুচ্চার প্রশ্ন আঁকা হয়ে যায়—কি হচ্ছে?

মুখটাকে আরো কাছে আনে শুভ্রা। সুরজিৎ-এর চোখের সমস্ত দৃশ্য ঢেকে দেয় শুভ্রার মুখ। শুভ্রার গলা যেন মায়ের মতো, কি হচ্ছে তা টের পাওনা। দিনদিন চোখের নিচে কালি পড়ছে, মেজাজ একটুতেই তিরিক্ষি, রাত্রে খালি ছটফট করো। এমনি করতে করতে একদিন দেখবে কি হয়।

গোধূলির অন্তিম আলো ওদের দু'জনের চোখের ওপর মরে গেল। শুভ্রার গলা মোমের মতো, আবছা অন্ধকারে ওর শরীর যেন একটা জলন্ত মোমশিখা। কপালের সিঁদুর টিপটাকে আঙুল ভেবে নিল সুরজিৎ।

—এখন উঠবে তো?

সুরজিৎ উত্তর দিল না। যেন শুনতে পায়নি এমনি ভাব করে অন্যমনস্কের মতো বসে থাকল, সেই সঙ্গে আরো খানিকক্ষণ বসিয়ে রাখল শুভ্রাকে। তারপর একসময় ওরা উঠল। এই ঝিনঝিনে অন্ধকার, গাছের পাতায় পাতায় দোল দিয়ে যাওয়া বাতাস, ঝিলের জলে একখণ্ড চাঁদের ঝকমকে অবয়ব—এইসব ভালো লাগার চিরন্তন ছবিগুলি সুরজিৎ-এর বুকের মধ্যে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। শুভ্রার আঁচল নিয়ে খুনসুটি মাতামাতি করে হাওয়া, কপালের ওপর উড়ে এসে

পড়ে চুল, তবুও নির্বিকার সুরজিৎ। কেননা, সে বুঝতে পারছে, তার মধ্যে সেই কষ্টের খেলাটা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই কষ্টের কাছে তার আত্মা নতজানু হয়ে যায়, বুকের মধ্যে অন্ধকারে ভেসে ওঠা সবুজ দ্বীপটি সমুদ্রের তলায় ডুবে যেতে থাকে। দূরতম নক্ষত্রের আলোক রশ্মির মতো দ্বীপের সবুজ স্বপ্নটা যেন অনন্ত জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে আর্তনাদ করে ওঠে। তখন, সুরজিৎ তার দুই কান ভরে বিসর্জনের বাজনা শোনে।

—এই বালমুড়ি কিনবে?

শুভ্রার গলায় সবুজ ছোঁয়া। সুরজিৎ নিঃশব্দে হাতের তালুতে পয়সা এগিয়ে দেয়। অনেক কৌশলে ভেতরের কষ্টটাকে গোপন করতে হচ্ছে সুরজিৎকে।

এমনি করে দিনের শেষভাগগুলো কাটে। কিন্তু রাত? রাতগুলো বড় কষ্ট দিয়ে তৈরি, বড় যন্ত্রণা আর আতঙ্ক। শুভ্রা টেরও পায়না, সুরজিৎ ওর বুকের কাছে ভয়ে আতঙ্কে আর না বলা কষ্টে কেমন নীল হয়ে যাচ্ছে। শুভ্রার গলা যেন জলের ঢেউ-এ ভেসে আসা দূরতম দ্বীপের গান, ওর শরীরের গন্ধে সবুজ স্বপ্ন. তবুও কিছুই আর হাতে করে নিতে পারে না সুরজিৎ। যেন সহসা তার সমুদয় বোধ বুদ্ধি একটা কষ্টের কাছে নতজানু হয়ে গেছে।

শুতে যাবার আগে আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল শুভ্রা। কোণের সোফায় সুরজিৎ যেন পাথরের মতো বসে। বসে বসে সেই কষ্টের খেলাটার সঙ্গে ভেতরে ভেতরে যুঝছিল। আয়নায় খোলা চুলে শুভ্রা। সুরজিৎ দু'হাতের তালুতে মুখ ঢাকতে চাইল। উজ্জ্বল আয়নায় শুভ্রার বাঁকানো গ্রীবা। সুরজিৎ তাকিয়ে থাকল। শরীরের মধ্যে টলটলিয়ে একটা সুখ বয়ে যেতে পারত, কিন্তু পারল না। শুভ্রা হাঁটু মুড়ে সামনে এসে বসার পরও না।

—এই কি হয়েছে তোমার?

সুরজিৎ মাথা ঝাঁকালো। অর্থাৎ তার কিছুই হয়নি, কিছুই হচ্ছে না।

—আজ পরিষ্কার করে বলতেই হবে তোমায়; তোমার কি হয়েছে। কোথায় অসুবিধে?

শুভ্রার গলা মা-র মতো ভরাট এবং আর্দ্র শোনাল। যেন একটা ব্যাকুল আর্জি ওর কণ্ঠস্বরে লুকিয়ে ছিল যা সুরজিৎ অনুভবে ধরতে পারল। কথা বলতে গিয়ে গলা জড়িয়ে যাচ্ছিল সুরজিৎ-এর। যেন কষ্টটা ভয় হয়ে গলার কাছে উঠে আসছে। শুভ্রার গলায় আর্জি আরো স্পষ্ট হলো। যেন মরুভূমির

মধ্যে নিঃশব্দ একটি কণ্ঠ শুভ্রার, করুণ গানের মতো আবার সুরজিৎএর বুকের মধ্যে বেজে উঠল, কি তোমার অসুবিধে? কোথায় তোমার কষ্ট?

ভেতরে ভেতরে ঘেমে নেয়ে উঠছিল সুরজিৎ। তার গলা বুজে এল। ভাঙা গলায় যেন কোনক্রমে সে বলল, আমার খুব ভয় করে শুভ্রা।

—ভয়! কেন? কিসের জন্যে?

শুভ্রার কণ্ঠস্বর আবার ভরাট এবং আর্দ্র শোনাল। সুরজিৎ হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে জলের গ্লাস নিয়ে জল খেল। আসলে নিজের কষ্টের কারণটা বুঝিয়ে বলতে পারছিল না সে। ফলে আরো একটা অস্বস্তি পেতে হচ্ছিল তাকে। মুহূর্তের জন্যে আয়নায় চোখ রাখল সুরজিৎ। আশ্চর্য, নিজের মুখ সে নিজেই চিনতে পারল না।

শুভ্রার চোখ তার মুখের ওপর এঁটে আছে। এমনই তীক্ষ্ণ শুভ্রার চোখের ভাষা যেন ভেতরে ভেতরে সুরজিৎকে নাড়া দিচ্ছে। সুরজিৎ গলা পরিষ্কার করল। মুখের মধ্যে আড়ষ্ট, অচল জিহ্বাকে সে নাড়াতে চেষ্টা করল, তবুও কোন কথা ফুটল না। যেন জলাশয়ের মধ্যে কোন অদৃশ্য হাত তার মাথা ডুবিয়ে দিচ্ছে। কেবল কষ্ট আর অস্বস্তি ছাড়া আর কোন চিহ্ন তার মুখে ফুটে উঠল না।

সুরজিৎ সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে ঘুরল, আয়নায় দাঁড়াল আবার বসল। শুভ্রার চোখ সুরজিৎ-এর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল। বুকের ভেতর থেকে কান্নার দমকে মুখে রক্ত উঠে আসার মতো সহসা ছলাৎ করে সে বলল, আমার বিশ্বাস, আমাদের সন্তান আমাদের অনন্ত যন্ত্রণার কারণ হবে। আমি জানি, আমরা কেউ না কেউ আমাদের ছেলের হাতে নিহত হব। এই সাজানো বাগানবাড়ি, তিল তিল করে জমানো সুখ, আমাদের নিটোল শয্যা সব তছনছ করে দেবে সেই ছেলে।

স্তম্ভিত শুভ্রা ত্রস্তে সুরজিৎ-এর মুখে হাত চাপা দিল।

কি বলছ তুমি? তুমি কি পাগল হলে নাকি?

সুরজিৎ এতক্ষণে হাসতে পারল। ক্লিষ্ট হাসি। মনে মনে বলল, তুমি বিশ্বাস করবে না জানি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমি তাকে দেখতে পাই, অন্ধকারে সে থাকে, ঘুমোলে সে আমার চোখের পাতায় এসে দাঁড়ায়। দু'পায়ে অন্ধকার মাড়াতে মাড়াতে আমার বুকের ওপর দিয়ে মড়মড় করে সেই শিশু হেঁটে যায়। অথচ আশ্চর্য, তুমি জানো না শুভ্রা, এই শিশুই তোমার

গর্ভের আশ্রয়ে ঘুমিয়ে আছে—এই আমাদের ভবিষ্যৎ, আমরা তিল তিল করে একেই বড় করে তুলছি।

ঠোঁট নড়ছিল সুরজিৎ-এর। শুভ্রা তার মুখ এগিয়ে আনল। নিঃশব্দে সময় বয়ে যেতে লাগল ওদের। আস্তে আস্তে শুভ্রার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে এল। যেন ভয়ঙ্কর কোন পরিণামের সামনে এসে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভয় আর ভাবনা জড়ো হবার আগেই যেন বিপদ তার সামনে।

ঘরের মধ্যে ঢুকেল আলোর বৃত্তটা দেখতে দেখতে দুজনের চোখেই কেমন যেন অনুজ্জ্বল হয়ে গেল। কথা বলল শুভ্রাই প্রথম, কথা নয় যেন কবরের মধ্যে থেকে উঠে আসা চিৎকার। তোমার এরকম ধারণা কেন হচ্ছে জিৎ?

—কেন মনে হয় সেটা বুঝলেও বোঝাতে পারি না। শুধু এইটুকু মনে হয়, এখন এই সময়ে তোমার গর্ভে আমার যে সন্তান আসবে সে ওই রকমই হবে। আমাদের সহবাসের রাতগুলোর কথা মনে পড়ে? সেই নিষ্ঠুর আততায়ীর মতো একঘর অন্ধকার, বাইরে আর্তনাদ আর হাহাকার ছাপিয়ে গুলির আওয়াজ, বৃষ্টির ফোঁটার মতো ক্লান্ত রক্তপাত আর সার্চলাইটের আলোয় চমকে ওঠা দুঃস্বপ্ন।

—কিন্তু, কিন্তু তাতে আমাদের কী? আমরা কেন...শুভ্রা কথা শেষ করতে পারে না। যেন ভেতর থেকে কেউ তার জিহ্বা টেনে ধরে। তার মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো ছবি ভেসে ওঠে। সুরজিৎ আর শুভ্রা, দুটি মানুষ-মানুষী, হঠাৎ সরীসৃপে পরিণত, যাদের মেরুদণ্ড নেই, চোখের দৃষ্টি নেই, মুখে কোন ভাষা নেই। যারা কেবল স্থান থেকে স্থানান্তরে পালাতে উন্মুখ। সড়সড় করে তার গায়ের ওপর দিয়ে একটা ভীত কীট পালিয়ে যায়। পেছনে ছুটে আসে অনেক চেনা কণ্ঠের হাহাকার। শুভ্রা উঠে দাঁড়ায়। বুকের আঁচল গুছিয়ে নেয়। সুরজিৎ স্বগত প্রলাপের মতো বলে যেতে থাকে, যেন উদাস এক ধারাভাষ্য: আমি ঘুমোলে এখনো সেই শিশুর স্পর্শিত ছবিটা দেখতে পাই। রক্তপাত, আর্তনাদ আর অন্ধকারের মধ্য থেকে একবিন্দু তীব্র সবুজ আলোর মতো সে জন্ম নিচ্ছে। কাছে এলে দেখতে পাই তার ক্ষমাহীন দু' চোখে অনন্ত ঘৃণা—যা আমাদের জন্যে। ওই ঘৃণার মধ্যে আমাদের সুখী শরীর দুটোকে ডুবিয়ে মারতে চায়।

আমাদের এই রকম বেঁচে থাকা, সুখ চুরি করে গড়া সংসার, এই ঘর, চাকরী, পদোন্নতি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, ভবিষ্যৎ-এর জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা সব কিছু সে

ভেঙে ফেলতে চায়। তার চাওয়া এত তীব্র যে, তার উপস্থিতি মুহূর্তেই আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। অথচ তারই পায়ের শব্দে অরণ্য গান গেয়ে ওঠে, সূর্য উজ্জ্বল হয়, সমুদ্রের জল কলোচ্ছ্বাস করে পাখীদের ডাক দেয়।

আমি বুঝতে পারি, এই শিশুর হাতে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। ওঝা, এই ভয়, এই আতঙ্ক আমাকে ভাষায়, আমাকে নিয়ে খেলা করে।

এক নজে অনেকক্ষণ কথা বলে সুরজিৎ হাঁফিয়ে ওঠে। যেন তার বুকের রক্ত প্রত্যেকটি কথায় নিঙড়ে দিয়েছে সে। তার মুখ সাদা কাগজের মতো ফ্যাকাসে হয়ে যায়। অসহায় সুরজিৎ ওঝার ঘাড়ে মুখ গুঁজে দিয়ে আশ্বাস খোঁজে। ঘরের মধ্যে একটা বোলতার ক্রুদ্ধ চিৎকার ছাড়া আপাততঃ আর কোন শব্দ নেই। আয়নায় ওঝা এক ঝাঁক বোলতাকেই যেন উড়তে দেখল। সুরজিৎ তখন তার চোখের অন্ধকারে দূরের সবুজ দ্বীপটিকে ডুবে যেতে দেখছে। মুহূর্তের জন্য দু'জনেই আয়নায় চোখ ফেলল, কিন্তু সেখানে আজ আর কোন প্রতিবিম্ব ধরা পড়ল না। বরং সুরজিৎ-এর মনে হতে লাগল দর্পণের যাবতীয় দৃশ্য ভেঙে গুড়িয়ে সেই ক্রুদ্ধ শিশু বীরের মতো তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

নীলেশচন্দ্র সিংহ

বেওয়ারিশ লাশ

—এই যে আসুন স্যার।

আচম্বিত আমার চমক ভাঙল। আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রায় চিন্তামগ্ন ছিলাম। তাকিয়ে দেখি করোনার কোর্টের সুপরিচিত পুলিশ কর্মচারীটি দাঁড়িয়ে। মুখে আপ্যায়িতের হাসি। টেবিলের ওপরে একখানা সমন রেখে দিয়েছে।

—কি আজো আবার যেতে হবে? আমি একটু উষ্মার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করি।

—হ্যাঁ স্যার। পুলিশটির বেমানান মোলায়েম কণ্ঠস্বর।

—ক'টা মড়া?

—অনেকগুলি।

—পচা গলা যা পেয়েছে সব কুড়িয়ে এনেছে বুঝি?

—না একটা একেবারে তাজা। একটু আগে এসেছে।

—মেয়ে না ছেলে?

— ওই যে লেখা আছে—অজ্ঞাত পরিচয় হিন্দু পুরুষ।

সমনটা দেখে নিলাম। সমনের প্রাপ্তি স্বীকার করলাম। সমনের শেষ লাইনটা পড়লাম—নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না হলে জরিমানা দিতে হবে। সামনে বসা সামন্তবাবুকে ডেকে বললাম—ভগবান আপনার আজি শুনেছেন সামন্তবাবু। সকালে অফিসে এসে বলেছিলেন না—মাসকাবারে দু'চারটা মড়া দেখার কাজ এলেও তো কয়টা পয়সা পকেটে আসে। লোকের জীবনীশক্তি না হয় বেড়েছে, তা বলে অপঘাতে মরাও বন্ধ হল নাকি? ওদিক থেকে পঞ্চকেশ দেবেনবাবু এগিয়ে এলেন হাসিহাসি মুখে। এরা দুজনও সমন পেয়েছেন। দেবেনবাবু দীর্ঘদিন একাজ করে আসছেন। এ কাজে তার বিরক্তি নেই, বরং এক টাকা বিশ পয়সার প্রতি তার আসক্তি সুবিদিত। আমরা এ নিয়ে তাকে হাসিঠাট্টা করি। তিনিও তা সহাস্যে উপভোগ করেন। সামন্তবাবু বলেন—এতগুলি মড়া একদিনে না এসে দিনে একটা করে এলে দৈনিক একশ' বিশ পয়সা আয় হতো, কি বল দেবেন?

দেবেনবাবু মুচকি হেসে বললেন—তা যা বলেছ। একটা ছোটখাট পার্ট টাইম চাকরী হতো আর কি।

গত ক'বছর ধরে একাজ করে আসছি। এক সময় নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে দায়িত্বসম্পন্ন নাগরিকের কর্তব্য পালন করতে আসতে হতো। এখন তবু টি. এ. এবং টি. ই. হিসেবে এক টাকা বিশ পয়সা পাওয়া যাচ্ছে। মরা পচা গলা ফোলা থেঁতলানো পিষ্ট হওয়া ছমড়ে মুচড়ে যাওয়া অঙ্গহীন খণ্ডবিখণ্ড বিকৃত বীভৎস গোড়া গাড়ীবাড়ী চাপা খুন জখম হওয়া ছোরাগুলি বিদ্ধ বিষ খাওয়া ফাঁস দেওয়া পিটিয়ে মারা শ্বাসরোধ করে হত্যা জলে ডোবা লাফিয়ে পড়া সাপে কাটা ইত্যাদি কত রকমেই না মানুষ মরে। কোন রকম মৃত-দেহ দেখেই আজকাল আর মনোবিকার অনুভব করি না। বরং ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখি পুলিশ প্রদত্ত রিপোর্টের সঙ্গে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আঘাতের সাদৃশ্য আছে কিনা। প্রথম দিকে দুর্গন্ধে বমি বন্ধ হয়ে আসতো, গা ঘিনঘিন করতো; এখন আর নাকে রুমাল চাপা দিতে হয় না। মৃতদেহগুলির দিকে তাকিয়ে তোতা পাখীর মতো শপথ বাক্য পাঠ করি—"আমি এইসব ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে তদন্ত চলাকালে কোনপ্রকার ভয়ে বশীভূত বা অনুগ্রহে প্রভাবিত হবো না" ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমাগত বিকৃত মানব দেহ দর্শনে ইদানীং আর মনুষ্যদেহ সম্পর্কে কোন দুর্বলতা অনুভব করি না। কাঁচের আড়ালে শায়িত দেহগুলি যে কারো শ্রদ্ধেয় পিতামাতা আদরের ভাইবোন স্নেহের পুত্রকন্যা ভালবাসার বন্ধুবান্ধবী প্রিয়তম। পত্নী—এক সময় শ্রদ্ধাভক্তি স্নেহ প্রেম প্রীতি আদি সুকুমার মনোবৃত্তির আধার ছিল তা আর ভাবনাতেই আসে না। আশ্চর্য।

নির্দিষ্ট সময়ে আমরা এরকম পাঁচজন 'অনারেবল মেম্বার অব দি জুরী' দল বেঁধে হাসি মস্করা করতে করতে মর্গের তথা কোর্টের দিকে এগোচ্ছি। বন্ধুর বৌভাতে চলেছি যেন। ভাবছি আজ টিফিনটা ভালই জমবে। এক টাকা কুড়ি পয়সায় ছয়খানা লুচি আর এক'শ দই। না, চার খানা লুচি। ঘৃতের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে লুচি প্রতি পাঁচ পয়সা দাম বেড়েছে। তা হোক; চার খানা লুচি আর এক'শ দই বন্ধ হবে না।

করোনারের কোর্টে পৌঁছে প্রথম এক টাকা বিশ পয়সার বিল লিখে দিলাম। তারপর হাজিরা সই করলাম। গল্পগুজব করছি এমন সময় করোনার সাহেব এলেন। আমাদের নিয়ে লাশ ঘরে গেলেন। সঙ্গে আর্দালী পিয়ন, যে যে থানার এলাকা থেকে লাশ এসেছে তার একজন করে পুলিশ এবং কোন

কোন মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন। পুলিশ মর্গের মাঝখানে পুরু কাঁচের ছোট একটি ঘরে মৃতদেহগুলি সারি দিয়ে রাখা হয়েছে। তার বাঁ পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি লাশকাটা টেবিলে আরেকটা মৃতদেহ তোলা। এক্ষুনি চেলা করা হবে। একজন ডাক্তার-অধ্যাপক, একটা ডোম এবং ক'টি মেডিকেলের ছাত্র ডিসেকশন এর সময় শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে উপস্থিত। প্রবেশ মুখেই একজন কর্মচারী খুব মৌজ করে চা টোস্ট তৈরী করে খাচ্ছে।

চাপরাশিটি একটানে কাঁচের উপরের ভারী পর্দাখানা নাটকের ক্রীন অপসারণের মতো সরিয়ে দিল। আমরা সমবেতভাবে শপথ বাক্য পাঠ করলাম। করোনার একের পর এক রিপোর্ট পড়ে যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশটি বাইরে থেকে মৃতদেহ সনাক্ত করছে। কাঁচের ঘরের ভেতরে একজন ডোম হাত দিয়ে লাশটি নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছে। আমি রিপোর্টের বক্তব্যে কান রেখে নির্দিষ্ট দেহটি নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করে দেখছি। সর্বশেষ রিপোর্ট পড়ছেন করোনার—Body of an unidentified Hindu male aged about 25 years was found with bullet marks in the chest...অর্থাৎ একজন পচিশ বছর বয়স্ক অপরিচিত হিন্দু যুবকের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ....। আমি কৌতূহলী হয়ে মৃতদেহের দিকে তাকিয়েই চোখ বুজে ফেললাম। আমার শরীরের রক্তস্রোত দ্রুতগতিতে ওঠানামা করতে লাগল। একটা তড়িৎ প্রবাহ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। আমি আবার তাকালাম। আমার সর্ব শরীর কাঁপতে লাগল। আমি বাঁ হাতে কপাট আঁকড়ে ধরলাম। কি যেন একটা দলা পাকিয়ে আমার গলায় আটকে দম বন্ধ করে ফেলতে চাইছে। আমি আবার চোখ বুঁজে ফেলতে চাইলাম। কে যেন জোর করে আমার চোখের পাতা টেনে রেখেছে। একপাশে পড়ে আছে অসীমের নিষ্প্রাণ নিরাবরণ দেহটা। ঝড়ে উৎপাটিত অর্জুন বৃক্ষের মতো। বিকৃত বিধ্বস্ত লাশগুলির পাশে ওর বলিষ্ঠ দেহটা শুকনো ফুলের মাঝে সদ্য ফোটা একটা ফুলের মতো লাগছে। বুকের পাটা হাত পায়ের পেশীগুলি ইউক্যালিপ্‌টাস অয়েলে ভেজা। তার ওপর আলো পড়ে চকচক করছে। যেন এইমাত্র দৈহিক ব্যায়াম সেরে ও শবাসনে শুয়ে আছে।

অসীম আজ আননোন। ওর দেহ আইডেনটিফাই করতে কেউ আসেনি। কিন্তু ওর সমস্ত নাড়ী নক্ষত্র যে আমার জানা। কোন ডাক্তারের ডিসেকশনেই ওর আসল পরিচয় জানা যাবে না। ক্লাশে প্রথম পরিচয়ের দিন ও আমাকে বাইরে

ডেকে নিয়ে ছোট হাতে গলা জড়িয়ে ধরে স্কুল ঘরের টিনের বেড়ার গায়ে পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখে বলেছিল, পড়ে দেখ। আমি কোন প্রকারে পাঠোদ্ধার করেছিলাম—"তুমি আমার বন্ধু"। সেদিন থেকে আমরা একসঙ্গে তিল তিল করে বড় হয়ে উঠেছি। ওই দুই শালপ্রাংশু মহাভুজ দিয়ে ও আমাকে কতো জড়িয়ে ধরেছে। যেখানে হোক দেখা হলেই একবার জড়িয়ে ধরে ওর আবেগ জানাত। ওর বলিষ্ঠ আলিঙ্গনকে আমি বলতাম—ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন।

রিপোর্ট পড়া শেষ হলো। সবাই সেরেস্তার দিকে এগিয়ে গেল—ক্যাশিয়ারের হাত থেকে মড়া দেখার দক্ষিণা আদায় করতে। ভোজন বিদায় এক টাকা রাহাখরচ বিশ পয়সা। জমাদার কাঁচের ওপর পর্দাখানা আবার টেনে দেওয়ার ফাঁকে আমি শেষবারের মতো আরেক পলক ওর দেহটা দেখে সবার অলক্ষ্যে মাতালের মতো বাইরে বেরিয়ে এলাম। অসীমের মৃতদেহের দর্শনী বাবদ এক টাকা বিশ পয়সা সরকারের ঘরে আমার নামে জমা হয়েই রইলো।

জমা হয়ে আছে অনেক প্রীতি-কথা এবং স্মৃতি-কণা। যা আজ সুন্দরতম মধুরতম হয়ে আমার ভারাক্রান্ত মনকে আরো অশান্ত উদ্বেল করে তুলছে।

বন্ধুত্বের গভীরতা এবং ঘনিষ্ঠতায় আমরা ছিলাম উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আমাদের দু'জনকে কোথাও কদাচিৎ একা দেখা যেত। একা দেখলেই পরিচিত ব্যক্তিদের সকৌতুক প্রশ্ন—কি হে, জোড়া কোথায়? সহপাঠী বন্ধুরা রহস্য করে বলতো—'রয়্যাল পেয়ার'। তৃতীয় শ্রেণী থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা পাশ অবধি আমাদের আনন্দময় স্কুল জীবনের দিনগুলি কেটেছে এমনি একাত্মতার মাঝে। অথচ আমাদের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই ছিল বেশী। আমি স্কুলের সেরা ছাত্র; অসীম সেরা ফুটবলার এবং ক্রিকেটার। স্থানীয় ব্যায়ামাগারে শ্রেষ্ঠ দেহী। আমি ক্ষীণজীবি, কবিতা লিখি; অসীম প্রচণ্ড সতেজ প্রাণবান; ব্যায়াম করতে খুব ভালবাসত। লেখা-পড়ায় চলনসই। তবে অঙ্কে খুব ভাল মাথা। মাস্টার মশাইরা আমাকে স্নেহ করতেন, ওকে করতেন ভয় ও সমীহ। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় ওর নেতৃত্বে স্কুল টীম কি বছর বিজয়ীর সম্মান কেড়ে আনতো।

হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে আমি কলেজে ঢুকলাম। অসীম বললো, কি হবে আর লেখাপড়া করে। বি. এ পাশ করে ত কেরানী হবি, আর ঘুষ

খাবি। আমি ওসব মাড়াচ্ছি না। তার চেয়ে এমন একটা কিছু করে নেবো যাতে দশটা-পাঁচটার ঘানি টানতে না হয়। চাই কি একটা বঙ্গশ্রী, ভারতশ্রী বা বিশ্বশ্রী খেতাবও জুটে যেতে পারে।

সুতরাং অসীম বেশী করে খেলাধূলায় মনোযোগ দিল; ব্যায়াম চর্চায় গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করলো; অধিক পরিমাণে ছোলা খেতে সুরু করলো। প্রতি সিজনেই কাপ শীল্ড ও নানাবিধ পুরস্কারে ঘর ভরে তুলতো। দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় তার স্বচ্ছন্দ পেশী সঞ্চালন দেখে ছেলেরা হতো ঈর্ষান্বিত; আর মেয়েরা লুব্ধ ও রোমাঞ্চিত।

স্বাভাবিক নিয়মে ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় একসময় আমাদের দেখা সাক্ষাৎ কিছুটা কমে এসেছে। তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠত—মলয় বাড়ী আছিস? সেদিন আমি বসে বসে একটা কবিতা মক্স করছিলাম। অসীম এসে পাশে বসলো। বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করলো—জানিস মলয়, অটল পোদ্দার আচ্ছা ঘড়েল আদমী। শেষ পর্যন্ত আমাকে পাকড়াও করলো—ওর মেয়েকে পড়াতে হবে। বালিকা বিদ্যালয়ের ব্রজেন স্যার ত ভালই পড়ান। প্রাইভেট টুাইশনীতে ওঁর হাত যশ আছে। তার উপর আবার আমি কেন। মনে হচ্ছে ভেতরে একটা কোন কিন্তু আছে।

—কিন্তু আবার কি?

—দিন কাল যা পড়েছে বুঝতে পারছিস না। রেশনের দোকান—কয়েক শ' ফল্স্ কার্ড নিশ্চয়ই আছে। আবগারী দোকান—সেখানে ত বিনা লাইসেন্স এর মালের উদাম কারবার চলছে। তা ছাড়া—

—আর হাজার হাজার বস্তা চাল যে গুদাম ভরতি করে রেখেছে তার কথা বল। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা কে. জি.র চাল তিন টাকায় উঠেছে তবু মাল ছাড়ছে না।

—আমি তো সে কথাই বলতে যাচ্ছি। এখন চালের দাম বাড়ায় কিনে খাওয়া লোকদের মাথা গরম। রাজনৈতিক দলগুলি মজুতদার আড়তদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার দাবী জানাচ্ছে। কোথাও কোথাও হৈ হট্টগোলে দু' একটা গুদামও লুঠ হচ্ছে। তাই আমাকে হাত করা আর কি।

—তুই তো প্রাইভেট টিউটর। তোকে দিয়ে কি গুদাম পাহারাও দেওয়াবে নাকি?

—আঃ। কথা এত দেরীতে বুঝিস না, রাগ হয়। জানিস তো পাড়ার ছেলে

ছোকরাগুলি আমার কথায় ওঠে বসে। সুতরাং দরকার পড়লে বাইরের লোকের হাত থেকে পাড়ার প্রেস্টিজ রক্ষায় আমাদের লেলিয়ে দেওয়া যাবে। যাক গে, সে তখন দেখা যাবে। এখন তো মনে হয় এটা ভালই হলো, কি বলিস। কিছু টাকা পয়সার দরকার। হাত খরচ তো একটা আছে। বাড়ীর খবর তো তুই ভালই জানিস।

অসীমের বাবা স্থানীয় এক কারখানার সাধারণ কর্মচারী। যা মাইনে পান তাতে টেনেটুনে সংসার চলে। পরিবার ছোট নয়, সুতরাং পরিকল্পনার সংজ্ঞা অনুযায়ী সুখীও নয়। দ্বিতীয় কোন উপার্জনক্ষম লোক নেই। ছেলে এবারে একটা কিছু করুক এই তার ইচ্ছে। কিন্তু অসীমের মাথায় ওসব ব্যাপার ঢোকেই না। সব সময় হৈ হৈ রৈ রৈ করে বেড়াচ্ছে। ওর বাবা সেজন্য ওর ওপর বেশ বিরক্ত। বিশেষত ভদ্রলোকের কর্মজীবনের যবনিকাপাত হতে খুব বেশী দেরী নেই।

আমি অসীমকে বললাম—দেখ, অটল পোদ্দার তোকে তার চোরাই ও মজুত মাল সামলাতে বহাল করেনি। তার জন্যে অন্য লোক আছে। যারা আন্দোলন করছে তারাই তার মালের বড় পাহারাদার। থাকগে—ওসব গুহ্য ব্যাপারে মুখ না খোলাই ভাল। আমার মনে হয় ঘরের মাল সামলাতেই তোর চাকুরী।

—তার মানে?

—মানে, পোদ্দারের মেয়ে বড় হয়েছে। আশেপাশে হয়তো কাক বক উড়ছে, শিয়াল শকুনি ওঁৎ পাতছে। সুতরাং পোদ্দার বাঘ নিযুক্ত করেছে ফেউ তাড়াতে।

অসীম রাগতস্বরেই বললো—বাজে কথা বলিসনি মলয়। তোরা কবি-লেখক লোকগুলি একেবারে মেয়ে-শোঁকা। নাম শুনলেই তোদের নোলা ঝরে।

আরো কতক্ষণ কথাবার্তা বলে অসীম চলে গেল। কিছু দিন পর আমি বাজার করে ফিরছি। দেখি, অসীম হন হন করে আমাদের বাড়ীর দিকে আসছে। ঘরে ঢুকেই বললো—চল তোর পড়ার ঘরে; কথা আছে।

পড়ার ঘরে এসে পকেট থেকে চানাচুরের ঠোঙা বের করে বললো—নে, খা। চানাচুর চিবোতে চিবোতে বললো—শোন, শ্রীদুর্গা প্রেসে গিয়েছিলাম সরস্বতী পূজার চাঁদার বই ছাপাতে। দেখি সীমাদের এ্যাল্বুয়াল পরীক্ষার কোশ্চেন

ছাপা হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের রামের সুমতির প্রথম ক' লাইন ট্র্যানস্লেশন করতে দিয়েছে। সে তো একটু ইংরেজী করে, সীমাকে একেবারে চমকে দেবো।

—কিরে অসীম, তুই এত শীগ্‌গির সীমাবদ্ধ হয়ে গেলি? ব্যাপার কি?

—সে অনেক কথা। একেবারে কাঁঠালের আঠা। আরে বাপু আমি কাঠখোট্টা লোক। ছোলা খাই আর ঘোড়ার মতো ছুটি। আমার কি এসব প্রেমট্রেম আসে? এসব তোর মতো মিনমিনেদের কারবার।

—কিন্তু এতো উল্টো পুরাণ হয়ে গেল। যাক, আমার দ্বারা ত আর প্রেমে পড়া হলো না। কবিতা লিখেই প্রেমের ছবি আঁকি; আর তুই আনাড়ী শিকারী হয়ে একেবারে জ্যান্ত কবিতা শিকার করে বসেছিস্। বল, সব খুলে বল। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে। তোর কাছেই শুনি প্রেমের কয়টা হাত, কয় পা, লেজ আছে কিনা, চোখ কয়টি—।

—অসীম আমাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বললো—সে শালা নাকি আবার অন্ধ। তা যাক, জানিস তো আমি মেয়েদের তোয়াক্কাই করি না। নাহলে আমার যেমন সর্বত্র অবাধ গতি, একটু আস্কারা মক্তরা করলে ভুঁতির ওপর মাছির মতো ঝাঁক বেঁধে এসে গায়ে পড়তো।

—যে গায়ে পড়েছে তার কথাই বল শুনি।

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে দেখি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সীমা আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে।

—অর্থাৎ তুইও নিশ্চয়ই তাই করিস। ফলে আড়চোখে আড়চোখে মিলন।

—ফাজলামী রাখ। সেদিন বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। আমাকে বলেন—বিনা পয়সায় হাত তালির মোহ কাটিয়ে এবারে পয়সা রোজগারের পথ দেখো। শুনে মেজাজটা একদম খাপ্পা। পড়াতে গিয়ে হুঁ হাঁ করে দায় সারছিলাম। সীমা একটা অঙ্ক কষতে দিল। গোমড়া মুখে দু' তিন বার বুঝিয়ে দিলাম। সত্যিমিথ্যে জানি না, না বোঝার ভান করছিল যেন। দিলাম কষে এক চড়।

—সর্বনাশ! বুড়ো মেয়েকে চড় মেরে বসলি? তোর সাহস তো কম নয়।

—আঃ। কথার মাঝখানে বাধা দিস কেন? চুপ করে শোন না। চড়টা বুঝলি বেশ জোরেই পড়েছিল। টলটলে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল।

কর্সা গালে আঙুলের ছাপ। আরেক গাল এগিয়ে দিয়ে বললো—মার এগালে এক চড়। তবু তোমার রাগ পড়ুক।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তুই তখন কি করলি?

অসীম কটাক্ষ করে বললো—হুঁ, শুনতে খুব ভাল লাগছে বুঝি। তা শোন। তোর কবিতা রচনায় কাজ দেবে। নীরস কবিতা লিখেই জীবনটা নষ্ট করলি। এসব শুনলে যদি তবু একটু আর্দ্রতা আসে।

—বুকনি বন্ধ করে এখন তোর সীমা চৌহদ্দির কথা বল।

—বলছি, আমি একটু গলা নামিয়ে বললাম—খুব লেগেছে বুঝি? দেখি—বলে হাত বাড়াতেই ও আমার হাত সরিয়ে দিতে গিয়ে দু হাতে মুঠো করে ধরে রইলো। বোঝ তখন আমার অবস্থা। চোখে জল, মুঠোর মাঝে হাত, তুমি বলে সম্বোধন—সে এক বিচ্ছিরি প্যানপেনে ব্যাপার। আমার এমন মরন্ত দেহে যেন বেতপাতার কাঁপুনি লেগে গেলো। এর চেয়ে যদি বলতো, পাঁচ শ, একটা ডন বৈঠক দাও—তা অনেক সহজ হতো।

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—যাক শেষ পর্যন্ত হাতী খাদে পড়েছিল। অটল পোদ্দারের দূর দৃষ্টি আছে জানতাম; এখন দেখি তা ভুল।

—নারে মেয়েটা মোটেই বাপের মতো নয়। বাপের যে এত টাকা পয়সা তাতে ওর কোন গর্ব নেই। বরং দেশের ও দশের কথা ও খুব ভাবে। অটল পোদ্দার এখন বাড়ীতে বামপন্থী পত্রপত্রিকাও রাখে। সেগুলি সীমা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে। আমিও একদিন সুযোগ বুঝে এক ডোজ উচ্চশক্তি সম্পন্ন সমাজতন্ত্র খাইয়ে দিলাম। তাতে খুব কাজ দিয়েছে। সেদিন ও বলে কিনা—জানো, তোমার জন্ত আমার বন্ধুরা আমাকে হিংসা করে। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

—বারে এমন সুপুরুষ মাস্টার মশাই পেতে কোন্ মেয়ের না ইচ্ছে করে। ওরা পেলো না, আমি পেলাম। তাইতো ওদের হিংসে। তোমাকে নিয়ে কিন্তু মেয়ে মহলে খুব কানাঘুষা।

—কি বলে তারা?

—বলবে আর কি। খুব বদনাম দিচ্ছে। আর তার মূলে আমি। তবে তোমাকে টিউটর রাখার আসল কারণ কিন্তু কেউ জানে না; তুমিও না।

—তোমাকে পড়ানো ছাড়া কোন কারণ আছে নাকি?

—আছে মশাই আছে। আমি বড় হয়েছি। বাবার খুব ভয় পাছে পাড়ার

নন্তু সন্তুদের সঙ্গে কিছু করে বসি। বাইরে বেরুনো ঠেকাতে পড়া ও বন্ধ করে দিতেই চেয়েছিলেন। আমার কান্নাকাটিতে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন। তবে বেছে বেছে তোমাকে অতিরিক্ত টিউটর রেখেছেন, যেন ভয়ে কেহ এগোতে সাহস না পায়।

আমি হেসে বললাম—তা হলেই দেখ, আমার অনুমান সত্যি কিনা। অটল পোদ্দার চাষ রক্ষা করতে বেড়া দিয়েছিল; এখন বেড়াই চাষ খেতে সুরু করেছে।

—হ্যাঁরে লোকটা ভারি বজ্জাত সেয়ানা। কোথায় কখন কাকে দিয়ে কি কাজ উদ্ধার হবে তা ভালই জানে। তাই বেছে বেছে 'আকলিক গুরুকে' পড়ানোর নামে মেয়ের পাহারায় নিযুক্ত করেছে। যাতে চেলারা গুরুর ভোগে ভাগ বসাতে সাহস না পায়।

—কিন্তু তুই এতো ভাল ভাল বাংলা বলছিস কি করে বলতো। বাংলায় তো ডিরিশ-এর বেশী পেতিস না। তাও রমেন স্যার ভয়ে ভয়েই তোকে পাশ মার্ক দিয়ে দিতেন।

—এসব তোদের সেই ইউক্লিডের লীলা আর কি?

—ইউক্লিড কিরে বাঁদর। বল কিউপিড।

—ও একই হলো। জ্যামিতি আর পীরিতি দুটোই দুর্বোধ্য। পরিমিতি পাওয়া দায়।

আমি কাব্য করে বললাম—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর'—ও আমার ঘাড়ে বিরাশি দশ আনা ওজনের এক গাট্টা মেরে বেরিয়ে গেল।

সীমা সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারই অসীম আমার কাছে গোপন রাখেনি। মাঝে মাঝে এসে পেটের কথা সব উজাড় করে যেতো। একদিন এসে বললো—দেখ মলয়, মেয়েদের বুকে ওঠা ভার। ক'দিন আগে সিনেমা হলে আমাদের শরীর প্রদর্শনী ছিল। তুই আজকাল কি করিস বুঝি না, দেখতে ত গেলিনা। সন্ধ্যাবেলা সীমাকে পড়াতে গেলাম। চোখে মুখে প্রশংসা ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে বললো—তোমার ফাইন্যাল পোজটা আমার যা ভাল লেগেছে কি বলবো। তোমার বুকখানা কি সুন্দর! দেখে আশ মেটে না। শুধু একা আমাকে ও রকম পোজ নিয়ে একবার দেখাবে?

আমি বললাম—বুক চিরেও কি দেখাতে হবে যে কার ছবি আঁকা আছে?

—হুঃ। হনুমানদের কথাই ওরকম। সব কথায় কেবল ইয়ারকি। সীমা মুখ বেঁকিয়ে বললো। জানিস মলয়—আমি ওকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি—ভালবাসা হলো আলো, মনের আঁধার দূর করে। ঝোপেঝাড়ে বসে বাদাম ভাজা, আর সিনেমার অন্ধকারে, রেস্টুরেন্টের নির্জনতায় এখানে ওখানে হাত চালাচালি প্রেম নয়। আমার দ্বারা ওসব চলবে না। শুনে বললো—অসভ্য কোথাকার, কোন কথা মুখে আটকায় না।

বি. এ. পাশের পর পৈত্রিক সূত্রের জোরে আমার একটা হিল্লে হলো এক কলেজ অফিসে। অসীম তেমনি ভানপিটেমি করে বেড়াচ্ছিল। সর্বজনীন পূজার চাঁদা সংগ্রহ, সন্তরণ ও দৌড় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান, রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্যাণ্ডেল বাঁধা, তুবড়ী কম্পিটিশনের বিচারক প্রভৃতি নানা কর্মকাণ্ডে ওর দিনগুলি ঠাসা। ইতিমধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঁকা ও কুটীল পর্ব সুরু হয়েছে। দেশের একদল লোকের হাত ও মুখ বেদম খুলে গেছে; আরেক দল প্রাচ্যদেশীয় তিন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আদর্শে চোখ কান মুখ বুজে আছে। এই তামাতোলের মধ্যে অটল পোদ্দার হাজার পঞ্চাশ টাকা খরচ করে চাকঢোল বাজিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল।

পথে একদিন দেখা হতেই অসীম আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললো—বুঝলি মলয়, মেয়েরা প্রজাপতির রঙ ধরে বেড়ালে কি হবে, আসলে ওরা শোঁয়াপোকা; যার গায়ে পড়ে তার আর জলুনির শেষ নেই।

—ওসব কথা রাখ। এখন একটা কাজকর্মের চেষ্টা কর তো অসীম। তোর বাবা ত রিটায়ার করেছেন শুনেছি।

—হাঁ, ভেবেছিলাম অটল পোদ্দারের হুঁকোয় ত সব দলের নেতাই তামাক খায়। তার বাড়ীতে পড়াচ্ছি। সেই সূত্রে আশপাশের কারখানায় একটা কিছু জুটিয়ে নেবো। কিন্তু পোদ্দার শালা পাতায় পাতায় ঘোরে। আমার ওপর মেয়ের হার্ট উইকনেস্ আঁচ করতে পেরেছিল মনে হচ্ছে। তাই দুম করে বিয়েটা দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দিল।

—তা পার্টির অনেক দাদাই তো তোকে চেনে। তাদের ধর না।

—সে কি আর বাকী রেখেছি! তাদের লম্বা চওড়া বুলি। পার্টি অফিসে এসো। দলের কাজ করো। পার্টির ক্লাসে যোগ দাও। সংগঠনকে মজবুত করো। ক্লাব সমিতিগুলিকে আমাদের পার্টির কন্ট্রোলে নিয়ে এসো। নিজের

মা বাপের কথা চিন্তা না করে সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মা বাপের কথা চিন্তা কর—সব বুজরুকী কারবার আর কি। জীবনে অনেক বড় কিছু করবো আশা করেছিলাম : এখন কোনমতে ছোট একটা কিছু পেলে বর্তে যাই।

দেশব্যাপী অনিশ্চিত রাজনৈতিক আবহাওয়া হাল্কা থেকে মাঝারী ও ক্রমে প্রবলাকার ধারণ করলো। খেলাধূলার চর্চা বন্ধ। ক্লাব সমিতি লাইব্রেরীতে তালা ঝুলছে। কোথাও বা সেগুলি পার্টি অফিসে পরিণত। যুব ও ছাত্র সম্প্রদায় স্থানীয় পার্টি অফিসগুলিতে ভীড় জমিয়েছে। পরস্পর জানতে পারলাম অসীমও শরীর এবং মন চর্চা ত্যাগ করে রাজনীতি চর্চায় মেতেছে। যে এক্দিন অন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছে, সে এখন অপরের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। নিজ দলের পোস্টার সাঁটছে, বিপক্ষের দেওয়াল লিপি মুছে দিচ্ছে। পাড়া থেকে অন্যদলের সমর্থকদের উৎখাত করছে। পুরণো সঙ্গীসাথীরা অধিকাংশ ছিটকে পড়েছে। নতুন যারা জুটেছে তাদের সমাজে খুব সুনাম আছে বলা চলে না। বেশীর ভাগ সময় তাদের দেখা যায় স্টেশন ইয়ার্ডে, রিক্সা স্ট্যাণ্ডের পেছনে বটতলায়, চা দোকানের ভেতরে অন্ধকার কোণে ফুসফাস গুজগাজ করছে। ছাত্র ও যুবকদের প্রিয় অসীমদা এখন ওদের 'গুরু' তথা হেড মস্তান। সারাক্ষণ হৈ হল্লা করছে, রাঙা মাথায় ভাঙা নিয়ে মারমুখী হয়ে ছুটছে। চেহারা পোষাক পরিচ্ছদ কথাবার্তায় রুক্ষতা ; চোখের দৃষ্টি লাল। আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই। আমরা ভূতপূর্ব বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে পড়েছি।

আমাদের কাছে স্টেশন এলাকাটা বিপজ্জনক বলে গণ্য। সন্ধ্যার পরে পারতপক্ষে কেউ ওদিক মাড়ায় না। রাত হলেই বোমাবাজির হল্লা ও ওয়াগন ভাঙ্গার শব্দ দূর থেকে শোনা যায়। বিপক্ষের সভা পণ্ড ও ভিন্নমতাবলম্বী ছাত্র যুবকদের তুলে নেওয়ার রীতি চালু হয়েছে। শুনতে পাই, ওয়াগন ভাঙ্গা মালগুলি অটল পোদ্দারের নিজের নামে বুক করা। নিজেই কারসাজি করে ওগুলি ওয়াগন ব্রেকারদের দিয়ে ভাঙিয়ে নামমাত্র মূল্যে তাদের থেকে কিনে নেয়। আবার রেলওয়ে থেকে ঐ অপহৃত মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করে। থানাদার ওয়াগন ব্রেকারদের থেকে জলপানি বাবদ কিছু পায় ; পোদ্দারের কাছ থেকেও মাসোহারা আদায় করে। ওয়াগন ব্রেকারদের টাকা কিছু দলের তহবিলে, কিছু শুঁড়ির দোকানে, কিছু বোমা পাইপগান তৈরীতে, এবং বাকীটা উৎকট পোষাক পরিচ্ছদে ব্যয় হয়। থানায় অসীমের খুব খাতির। পথে ঘাটে পুলিশ তাকে সমীহ করে কথা বলে। স্বয়ং অটল

পোদ্দার তাকে আবার তোয়াজ করতে শুরু করেছে। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিছুদিন আগে অফিসে আসার সময় অসীমকে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তভাগ টেবিলে ক'জন সাকরেদসহ বসে থাকতে দেখেছিলাম। সেই শেষ দেখা। আমারই অজান্তে আমি যেন পা পা করে তার দিকে এগিয়ে গেছি। অসীম দূর থেকে আমার গন্তব্য অনুমান করতে পেরেছিল। মনে হয় তারই ইঙ্গিতে পলকের মধ্যে সাকরেদগুলি ছত্রভার মতো চারদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অনেকদিন পর ওর সামনে—একা। ও উঠলো না। আমি ডাকলাম—অসীম! ও কোন ভণিতা না করে বললো—মলয়, তুই কি বলতে চাস তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা ভাই। প্যাঁচে প্যাঁচে এত নীচে নেমে গেছি যে মাথা ভাঙা ক্ষুর মতো আমাকে আর তোলা যাবে না। যা, গাড়ী এসে গেছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে তোর ওপর ওদের সন্দেহ হবে।

আমরা তখন কেবলই অন্ধকারে নেমে যাচ্ছি। আমরা রাতের চেয়ে দিনকে বেশী ভয় করি। অন্ধকারের জীবগুলির পরিচয় চিহ্ন থাকে। তাদের চেনা সহজ। কিন্তু যারা আলোতে আমাদেরই অনুরূপ আকৃতি নিয়ে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ করছে তাদের আমরা সব সময় চিনতে পারি না; যদিও তারা নজদিগ হায়। বাড়ী থেকে বেরুলে কখন ফিরবো, আদৌ ফিরতে পারব কিনা—সে নিশ্চয়তা নেই। অফিস—বাড়ী আর বাড়ী—অফিস করে বেড়াচ্ছি। সেই নিরুগামী রাজনীতির দিনে 'তুলে নেওয়া' প্রথা চালু হলো। খেলার মাঠ পুজা প্যাণ্ডেল কারখানার গেট দোকানের গদী ট্রেন বাসের কামরা, স্কুল কলেজের ভেতর থেকে মানুষকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। পরে তাদের ধড় বা মুণ্ডু পাওয়া যাচ্ছে এখানে ওখানে। কেউবা একেবারে নিরুদ্দেশ। মানুষ—ভীতি আমাদের অস্থিমজ্জায় সংক্রামিত হয়ে পড়েছে। একদল লোক মনুষ্যজীবনের মূল্যবোধ একেবারে হারিয়ে ফেলছে। আরেক দল আপন প্রাণ বাঁচাতে জান্তব প্রবৃত্তিকেও হার মানিয়েছে। পথেঘাটে কুকুর বিড়াল গাড়ীচাপা পড়লে আমরা আহা উহু করি; আর মানুষ আক্রান্ত বা নিহত হতে দেখলে সমবেদনা প্রকাশেও কুণ্ঠিত হই। সমবেদনা সহানুভূতি ততদিনে বিভিন্ন রঙ ধারণ করেছে —তাদের সর্বজনীনত্ব হারিয়ে। আজ সকালে অফিস আসার মুখে খবর পেলাম কাল বিকেল থেকে অসীম নিখোঁজ।

সেই অসীমের মৃতদেহ আমার সামনে। এখন বেওয়ারিশ লাশ মাত্র। তার পরিচয় অজ্ঞাত। আমি অসীমের মৃতদেহ সনাক্ত করতে পারতাম। করলে খবর পেয়ে আপন লোকজন ছুটে আসতো। তাদের হাতে দেহ হস্তান্তর করা যেতো। চাই কি ফুলমালা পতাকা আচ্ছাদিত হয়ে তা শোভাযাত্রা সহকারে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হতো। 'অমর শহীদ অসীম তোমায় ভুলিনি ভুলবো না'—বলে ধ্বনি উঠতো। প্রতিশোধ নিতে অকালে ঝরে পড়তো আরেকটা সবুজ প্রাণ। এখন ওর মৃতদেহ সনাক্ত করলে দেহটা পুড়ে ছাই হবে; না করলে বেওয়ারিশ লাশ বলে মেডিকেল ছাত্রদের কাজে লাগবে। জীবিতাবস্থায় ওর দেহের বাহ্যিক সৌন্দর্যে অনেকে মুগ্ধ হয়েছে; এখন হয়তো ডাক্তারগণ চিরেকেটে তার অন্তর সৌন্দর্য দেখুক। বেচারারা ভাল 'ডেড বডি' পায়না বলে সেদিন দুঃখ করছিল। আর অসীম, আমার ছেলেবেলার বন্ধু অসীম—অনেক মস্তানের গুরু—অনেকজনের পরিচিত অসীম—আরো কিছুকাল নিরুদ্বেগে বেঁচে থাক।

প্রবীর সাহা

চেনা মুখ

হরিপদ কেরানীর সঙ্গে আকবর বাদশার কোন মিল না থাকলেও আপন গৃহকোণে সব কেরানীই সম্রাট এই সব ভেবে অমল আত্মপ্রসাদ লাভ করত আর বারবার কবিতার ছত্র দু'টি আবৃত্তি করত। তখন কলেজের জীবন ছিল।

মনের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা বেগবতী ঘোড়ার মতন রাশহীন ছুটোছুটি করত। কলেজের বিভিন্ন কার্য কলাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে নিজেকে বেশ অনেক উঁচুদরের লোক বলে মনে হত। লোন্তাল ফাংশান বাৎসরিক সম্বর্ধনা সব কিছুর মধ্যে নিজের আসন করে নেবার মত ক্ষমতা ছিল। অবশেষে সেই সব দিনের শেষ হল। বাবা মারা গেলেন। অল্প বয়সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তিনি, কারখানার চাকুরী জীবনে বিশেষ কিছু জমানোর সুযোগ করতে পারেন নি। ফলে অমল চোখে অন্ধকার দেখত। কারও দিন চিরকাল একই রকম থাকে না—তাই বলে হাবুডুবু খেতে হ'বে? নাকানি চোবানি খেতে হ'বে? বাবার কারখানার ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে হেন পদস্থ অধীনস্থ কর্মচারী নেই যাদের কাছে সে ভিক্ষার থলি নিয়ে দাঁড়ায়নি।

'আমাদের এখানে এখন গ্র্যাজুয়েট ছেলের দরকার। তুমি বাপু ডিগ্রী নিয়ে এস তোমায় চাকরী দেব'। রাগে ঘেন্নায় তাদের মুখে থুথু ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে। ডিগ্রী নিয়ে যাবার পর জানতে পেরেছে যে স্টেনোগ্রাফী বা নিদেন পক্ষে টাইপ না জানলে কোম্পানীতে চাকরী পাওয়া অসম্ভব।

এই সামান্য ডিগ্রী জোগাড় করতে আর সংসার চালাতে এক এক করে মায়ের বোনের প্রতিটি অলঙ্কার হারাতে হয়েছে। অবশেষে হতাশ হয়ে বুঝেছে চাকরী হবার নয়।

সংসারে সে একা নয়—মায়ের সঙ্গে আছে দু'টি বোন ভাই ও ভাগনা। নিজের অন্নের সংস্থান দূরে থাক তাদের জন্য সে যে কী করবে ভেবে কূল কিনারা করতে পারে নি। দরজায় দরজায় মাথা ঠুকে মরেছে—নো ভ্যাকেন্সী, সরি—শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। প্রতিদিন খবরের কাগজে ব্যর্থ পাতা

উলটে সে ভেবেছে এইবার তার কপালে একটা চাকরী লাগবে। যতবারই সে আশায় বুক বেঁধেছে ততবারই তার আশা ধূলিসাৎ হয়েছে।

একটি একটি করে কয়েক বছর গড়িয়ে যায়, অমল স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন চোখ কচলে ভাবল যাই হোক তাই হোক আজ থেকে সে অসৎ পথে পা বাড়াবে। ছটকে, ফটকে মানকা ওরা এককালে তার সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। অনেক আগেই ওরা লাইনে ভিড়ে গেছে। আগে ওকে টিট্‌কারী মারত। এখন ওর দিকে তাকায় আর মাঝে মাঝে সহানুভূতির চোখ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলে—কথায় মস্তানীর টান থাকে কিন্তু সমবেদনা অনুভূতি বোঝার মত বুদ্ধি অমলের আছে। সংসারে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেও এই সব বখে যাওয়া বন্ধুরা তার সঙ্গে হেসেই কথা বলত। নিজের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করতে করতে সে ভাবল ঐ পথেই নিয়তি তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ছেঁড়া কাপড়ে সোমত্থ বোনেদের আর লজ্জা ঢাকা পড়েনা। হাঁড়ির মাপা চাল তা থেকেও মা তার জন্য দু'মুঠো সরিয়ে রাখে, ঘরভাড়া ক'মাসের বাকী। কেমন করে যে চলবে তা নিজেই জানে না—নিজের অক্ষমতার আক্রোশে নিজেকেই খুন করতে ইচ্ছে করে। বাড়ীর সবাই আশার দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার অক্ষম পৌরুষত্ব তার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরাচ্ছে। হতাশায় ক্রোধে নিজের প্রতি চরম আক্রোশে সে ছটকেদের একদিন বলেই ফেলল, 'আমায় তোদের দলে নিবি, আর পারছি না'। এটুকু বলতেই তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চারদিকের বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল। ছটকেদের সবাই অবাক বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাল। 'তবে কি তবে কি—এখানেও নো ভ্যাকেন্সী'—ভাবতে ভাবতে তার মাথার চারপাশ বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠল। শেষ অবলম্বন, সেটুকুও নেই—চোখের জল আর চাপতে পারল না সে। ছুটে চলে যাচ্ছিল।—মানকা হাত ধরে বসল। 'তুই যা বলছিস ভেবে বলছিস ত?' সজল চোখে অমল ঘাড় নোয়াল। 'তবে আয় আমাদের সঙ্গে'।

'তোর মত লেখাপড়া জানা ছেলের এ লাইন নয়—'।

'জানি, জানি'—যার সমস্ত দুয়ার বন্ধ যার চারপাশে শুধু হাহাকার কেঁদে মরে তাকে এভাবে বেঁচে থাকতে হবে—সে এতসব বোঝে না—তাই সে বলে ওঠে, 'তোরা শিখিয়ে দিলেই আমি পারব, বিশ্বাস কর।'

ওরা কী সব পরামর্শ করল—তারপর ওরা বলল, 'ঠিক আছে, আমাদের

মতন কাজ তোকে করতে হবে না—আমরা না ঘরকা না ঘাটকা—তোর মাথার উপর দায়িত্ব আছে—এক কাজ কর—সাট্টার বুকির এ্যাসিষ্টেন্ট হয়ে যা তুই—মাস মাস মাইনে পাবি। পুলিশ জানতে পারবে না। সত্যেনবাবুর বাড়ীতে চলে যাবি—স্লিপ আসবে—হিসেব করবি কোন ঘরে কতটাকা খেলা হয়েছে। হ্যাঁ ভাল কথা ভাই তোমার এ লাইন নয়। তুমি চাকরীর চেষ্টা চালিয়ে যাও, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না তুমি এলাইনে আছ। যেদিন চাকরী পাবে সেই দিনই এ লাইন থেকে সরে যেও—অনেক বন্ধু, অনেক শত্রু আমরা দেখেছি—তোমার জাত আলাদা—তুমি সেই সব দলের নও।—'

সেই থেকে অমল এই লাইনে আছে। অবসর পেলেই সে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করে। এমন এক সন্ধ্যার মাঠের এক কোণে চুপচাপ বসেছিল আর সে ভাবছিল কতদিনে তার রাহুমুক্তি ঘটবে। একটা চাকরী আর একটু স্বাচ্ছন্দ। তার কানে এল দু'টি ছোট্ট কথা, 'আমাকে ভালবাসবে ত? বল না, বল না গো'। তার মনে হ'ল কথাগুলো যেন ভিক্ষা চাওয়ার মত করে কেউ বলছে 'আমাকে একটু ভালবাসা দেবে'—কত কঠিন কথা অনায়াসে বলা হচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখে দু'টি তন্ময় ছেলেমেয়ে তাদের কথায় মগ্ন। এমন ভিক্ষুকের মত কেউ ত চায় না। তার মনে পড়ে নীলার কথা—নীলা সেও ত তাকে ভালবাসত। সে চাইত অমলের ভালবাসায় উল্লসিত হয়ে উঠতে। যার ঘর নেই সে ভালবাসাকে আহ্বান জানায় কি করে। ঐ ছেলেমেয়েদের ভালবাসা সার্থক হয়ে উঠুক—সে প্রার্থনা করল। এমন ভিক্ষুকের মত দীনভাবে ভালবাসা কেউত চায় না—সবাই ত জানে এটা অনায়াসলব্ধ বিষয়, ভালবাসার এমন সত্য সন্ধান তার জীবনে এই প্রথম।

তার জীবনের তিরিশটা বছরে সে দেখেছে বঞ্চনা দারিদ্র্য হতাশা এবং এখন সে সেই বঞ্চনার ইতিহাস। সে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী, মাঝে মাঝে সে বাস্তব জীবনকে ভুলতে চেষ্টা করে। আঁকড়ে ধরতে চায়, যে ভবিষ্যৎ আসবে বলেও আসে নি—অথচ অলীক স্বপ্ন কেটে গেলে সে আরও অস্থির হয়ে পড়ে।

তার জন্ম ১৯৪০/৪১ সালে। তার দেশ স্বাধীন হয়েছে—অথচ সে আজও এই স্বাধীন শব্দটুকু আঁকড়ে ধরতে পারছেনা। স্বাধীনতার যুদ্ধ সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। ছোট বেলায় যেবার প্রথম স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সে দিনের একটা স্মৃতি আজও তাকে কৌতুক দেয়। ফুলের মালা, জাতীয় পতাকা, বিউগল বাজিয়ে এবং ড্রাম কেট্‌স্ বাজিয়ে মিছিল করা

চেহারাগুলো আজও ভেসে ওঠে। উৎসব দেখতে দেখতে সে প্রশ্ন করেছিল এই রকম বুঝি প্রতিবছর হয়—তার তখন সবে জ্ঞানোদয়। স্বাধীনতার কথা বোঝার মত ক্ষমতা তার তখন ছিল না। তার কথা শুনে সবাই হেসেছিল। অথচ সেই স্বাধীনতার প্রভাব যথেষ্টভাবে তার উপর বিস্তার করেছে। রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসে দেশ ভাগ হয়েছে। প্রদেশে প্রদেশে স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে। নিজের দেশে সে পরবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছে আর সেই অসৎ পথে তাকে রোজগার করতে হচ্ছে, যে পথে তার যাওয়া উচিত নয়, যে পথ সর্বনাশা পথ। কারখানার শ্রমিক, অল্পবয়সী ছেলেরা, অত্যন্ত সাধারণ লোক—কিছু পয়সা পাওয়া যাবে এই আশায় চার আনা থেকে দশ টাকা পর্যন্ত খেলছে আর প্রতিদিনের হতাশায় আবার বুক বেঁধে জুয়ার নেশায় মত্ত হচ্ছে। এই কাজ তার ভাল লাগে না। অথচ কি কাজ সে পাবে। সত্যেনবাবু তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন না। ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। অথচ সে পারছে না—এই জীবনটাকে গ্রহণ করতে। এই সর্বনাশা পথে মানুষ ক্রমশ ধ্বংসে হচ্ছে এবং আরও ধ্বংস হবে। বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িয়ে চালের আশায় বসে থাকা কোন পরিবার অবশেষে কিছু না পেয়ে উনুন নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে—কী নিদারুণ যন্ত্রণা। তাদের পয়সায় সে তার মাকে বোনকে ভাইকে খাওয়াচ্ছে, নিজেও খাচ্ছে। কী ঘেন্না, কি ঘেন্না—তার মুখে থুথু ছুটে আসে, অন্ধ যাতনায় সে দরজা খুলে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়—কিন্তু এ ছাড়া পথ কই—নিজের জালেই সে বদ্ধ।

সে ভাবে এই কী জীবন। এক সর্বাঙ্গীন বোধহীনতা তাকে বেদনা দেয়। কাজ ফেলে সে ছুটন্ত গাড়ী, চলমান মানুষ, রৌদ্র উদ্ভাসিত রাজপথ দেখে আর একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা সঙ্গোপনে তার মনের মধ্যে কাজ করে চলে—কবে সে চাকরী পাবে, আবার মানুষের মত বেঁচে থাকবে।

অবশেষে এই সম্বলটুকুও গেল। সত্যেনবাবু ধরা পড়লেন। অস্থায়ী নীড় ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ইতিমধ্যে দেশময় অরাজক অবস্থার তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়ে গেল। দারিদ্র্যে অসহায় পশু মানুষগুলো কিছু বোঝার আগেই কালের রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি শোনা গেল। মানকা ফটকেরা একদিন এসে বলল, 'কী গুরু আবার বেকার। পারলে না চাকরী জোটাতে। আমরা চেয়েছিলাম অন্ততঃ তোমার মতন একজনও সৎপথে থাকুক। তা আর হ'বার নয়—শোন, আমরা জানি তোমার অবস্থা—

চল আজ একটা দাঁও মেরে আসি। আজ সন্ধ্যেবেলায় আমাদের ক্লাবে এস—কথা হ'বে।' যাক তা'হলে ওর কথা ওরা অন্ততঃ ভোলে নি।

বিকেলে পথে বেরিয়ে দেখে কেমন যেন থমথমে ভাব। আশেপাশে সবাই চাপাস্বরে কথা বলছে—বেশ উত্তেজনার ভাব ছড়িয়ে আছে চারদিকে। ক্লাবঘরে কোন আলো নেই। সবাই জড়ো হয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটা মোমবাতি জ্বলছে। কয়েকজন তার চারপাশে বসে কী যেন দেখছে। বাইরের দরজায় একজন পাহারা ছিল। সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'কি চাই।' 'মানকা আমায় আসতে বলেছে'। 'ওঃ যান ভেতরে'। কারও মুখ দেখতে পাচ্ছেনা—মানকা বা ফটকে কাউকে দেখতেও পাচ্ছে না।

মোমবাতিকে ঘিরে বসা ছেলেগুলোর শক্ত চোয়ালে কেমন যেন এক দৃঢ় প্রত্যয়। ওরা যেন কিছু একটা করবে—উত্তেজিত মুখ অন্ধকার বিভীষিকা দেখে সে ভয় পেল। অথচ এ পথে তাকে আসতেই হবে, ভয় পেলে ত চলবে না। মনটা শক্ত করতে হ'বে।

একজন বলে উঠল 'লোকে বলছে, আমরা যা করেছি তা নাকি খুব ভাল হয়েছে'—

'হ্যাঁ, ওরা বলছিল আমাদের যা করা উচিত ছিল—এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার করে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা আমরাই প্রথম করলাম,' দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর বলে উঠল। তৃতীয় একজন প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'দূর, বুড়ো লোকগুলো বলছিল, আমরা নাকি ভয়ঙ্কর কাজ করেছি। তারা ছেলেদের শাসন করে বলছিল বাড়ী থেকে বেরুলেই ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো'।

কণ্ঠস্বরগুলো কিন্তু আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। চারদিকে চাপচাপ অন্ধকার। মোমবাতির আলো ঘুরে ঘুরে একটু অস্বচ্ছ আবরণ গড়ে তুলেছে। মাঝে মাঝে ছুটন্ত গাড়ীর হেডলাইটের আলো তির্যকভাবে জায়গাটা উদ্ভাসিত করে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে এত ভীষণ নিস্তব্ধতা যে তার বুকের মধ্যে ভয় গুর গুর করে উঠছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঋজু কণ্ঠস্বরে একজন বলে উঠল, 'বন্ধুগণ, তোমরা আজকের ঘটনা জান, সবাই বোধ হয় জান না, আমরা আজ একজন শ্রেণী শত্রুকে খতম করেছি। লোকটা মানুষের দারিদ্র্য অবস্থার সুযোগ নিচ্ছিল। তাকে আমরা বহুবার সাবধান করে দিয়েছিলাম—শেষ পর্যন্ত সে সাবধান হলো না—অগত্যা আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করলাম। ৪২-৪৩ সালের মত দুর্ভিক্ষ আবার

সৃষ্টি করার চেষ্টা চলেছে। একজন চালের ব্যবসায়ী আজ রাত্রেই তার গোডাউন খালি করে সহরে চাল পাচার করবে। আমরা তৈরী আছি—আজ-রাত্রে আমরা বাধা দেব। তোমরা ঠিক রাত দশটায় চৌমাথায় মোড়ে উপস্থিত থাকবে। ফটকে তোমাদের কাকে কোথায় ডিউটি দিতে হবে জানিয়ে দেবে। বন্ধুগণ। তোমরা এখনকার মত যে যার বাড়ী চলে যাও।' বক্তার কথা শেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ফুৎকার দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল। চারিদিক অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠল।

এই সব কথাবার্তা এবং কাজ তার খুব ভাল লাগছে—কিন্তু তার মা, বোন ভাইরা তাদের খাওয়াবে কে? সে যদি এদের মধ্যে চলে আসে, প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে তা'কে নামতে হবে। তা'হলে, তা'হলে? এ পথ তার নয়—তবে তার কী পথ সে কথাও সে ভাবতে পারছে না। কাঁধের ওপর কার হাতের স্পর্শ সে পেল। সে কিছু বলার আগেই ফিসফিস করে বলল, 'এখন কিছু ভাবতে হ'বে না—যদি ভাল না লাগে তবে বাড়ী চলে যা—কাল দেখা হবে।' কণ্ঠস্বরে বুঝল মানকা। সে বলতে চাইল—'না, ব্যাপারটা তা নয়। আমি ভাবছি, এমন কাজে সরাসরি আসায় আমার অসুবিধা আছে—আমার বাড়ীর কী হবে ওদের কে দেখবে?' মানকা বলতে চাইল, 'আমরা দেখব'—সঙ্গে সঙ্গে ভাবল আমরা সবাই ত আর জেলের বাইরে থাকব না তখন কে কাকে দেখবে। সে নিজে একজন গুণ্ডা, তার নামে সবাই কাঁপে। সে হয়ত একদা ভদ্র ছিল, কিন্তু আজ তার মধ্যে অন্য এক আগরণ এসেছে। তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত মস্তানী করে বেড়িয়েছে, কিন্তু এরপর? এখনও পর্যন্ত সে যে সব কাজে ব্যস্ত তাতে ঝুঁকি আছে অনেক, লাভও আছে অনেক—কিন্তু তারপর চল্লিশ যখন পেরোবে তখনও কি তাকে এই অন্ধ্র জীবন যাপন করতে হবে। মানুষ তাকে ভয় পায়—কেউই শ্রদ্ধা করেনা ভালবাসেনা। তাছাড়া, ঐ সব লেখাপড়া জানা ছেলেগুলো, যারা মস্তানীর ম'ও জানে না, কেমন রাতারাতি দেশময় আলোড়ন সৃষ্টি করল; আর সে কী না দেশের জন্য এটুকুও করতে পারবে না—তাছাড়া তার কোন পিছুটান নেই; সে নিজে যা ইচ্ছে হ'তে পারে তাই বলে ত আর অমলের মত ভাল ছেলেকে এমন ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায় না। তাই বলল, 'আজ বাড়ী যাও। কাল যা হয় হবে।'

সারারাত ঘুমাতে পারেনি অমল। সে জীবনের সমস্ত অংশটাকে মনের পর্দায় প্রতিফলিত দেখল— সে তাকিয়ে দেখল মায়ের অসহায় মুখ, রুগ্ন ক্যাকাসে

বোনগুলো আর দারিদ্র্য পীড়িত ভাই ও ভাসনার চেহারা। সারারাত সে নক্ষত্র খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে কি এক আশ্রয় খুঁজতে চেয়েছে। তার কর্তব্য পরিবারের প্রতি এবং তার কর্তব্য দেশের প্রতি। আজ যদি সে এই সংকীর্ণ কর্তব্যকে অবহেলা করে বৃহত্তর কর্তব্যের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা'হলেও কী সে অন্যায় করবে ?—

সমস্ত রাত ভেবেও সে ঠিক করতে পারল না—ভোরের আলো ফুটে উঠব উঠব করছে। ফার্স্ট লোক্যাল ট্রেনটা গর্জন করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের আওয়াজে তার মন সচকিত হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল তার এক পরিচিত হকারের কথা। যে ট্রেনে লজেন্স ফিরি করে বেড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটল। তখুনি সে গায়ে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। তাকে বাঁচতে হবে। পরিবারের সবাইকে বাঁচাতে হ'বে—সে ট্রেনে ট্রেনে হকারী করে বেড়াবে—অন্ততঃ এ ব্যবসাটা অসৎ ব্যবসা নয়—তার আপন গণ্ডীর মধ্যে আপন চিন্তার মধ্যে সে স্বাধীন হয়ে থাকতে পারবে—হরিপদ কেরানীর সঙ্গে আকবর বাদশার মিল থাকুক আর নাই থাকুক আপন কাজের মধ্যে সে সম্রাট হয়ে থাকবে। উষার আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে—তার চোখে মুখে সর্বাঙ্গে। তার মুখে এক অনির্বচনীয় আশার আলো—ওকে বাঁচতে হ'বে।

অসীম চক্রবর্তী

প্রয়োজনের ঘর

সুলতা সবে মাত্র অফিসে এসে সীটে বসেছে। তখনও হাত মুখ ধোয় নি। ছেলেটি ঘরে ঢুকে সামনে ওকে-ই দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—যদি কিছু মনে না করেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ. কে. রায় কোথায় বসেন বলবেন? ছেলেটিকে একবার ভাল করে দেখে নিতে সুলতার বেশ কৌতূহল হোল। মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন বলুন তো? ইণ্টারভিউ আছে বুঝি? গোবিন্দ নামের ছেলেটি বিব্রত বোধ করল। যথেষ্ট সংকোচের সঙ্গে বলল. হ্যাঁ। বেলা এগারোটায় ইণ্টারভিউ। পিয়নের পোস্ট। সপ্রতিভ, বলিষ্ঠ অথচ মার্জিত চেহারার একটি তরুণকে পিয়নের পোষ্টের প্রার্থী হিসেবে ভাবতে কেন জানিনা সুলতার কৌতূহল আরো বাড়ল। যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, এগারোটার তো এখনও অনেক দেরী, একটু বসুন। সময়মত আমি আপনাকে ডি-সি'র ঘর চিনিয়ে দেব। গোবিন্দ সামনে দেয়ালের কাছে পাতা বেঞ্চটায় বসল। সুলতা হাত মুখ ধুতে উঠে গেল।

সুলতা আয়কর সংক্রান্ত এই বিভাগীয় অফিসটির ইউ-ডি ক্লার্ক। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়েস হবে। পি-এল-সি তে পাশ করে বছর পাঁচেক হোল এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পিয়ন থেকে অফিসার অব্দি কতো লোক ইণ্টারভিউ দিয়েছে নতুন চাকরী পেয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। না, কোনদিন তাদের কেউ ওর কাছে আজ অব্দি এমনতর কোন সংবাদ জানতে আসেনি। কেউ না। এই ছেলেটি অর্থাৎ গোবিন্দই প্রথম এবং হঠাৎ ওদের সেকশনে কেমন করে যেন ঢুকে পড়ল। এবং শুধুমাত্র ঢুকে পড়া নয় প্রশ্নটা সরাসরি ওকেই করেছে। হয়তো এসব ভাবনার কোন অর্থই হয় না। তবু বেসিনে হাতমুখ ধুতে ধুতে সুলতার ভাবতে ভালো লাগল।

সুলতা সীটে এসে বসতেই গোবিন্দ কথা জুড়লো—জানেন, আমি সেভেনটিতে বি-কম পাশ করেছি। এই ক'বছরে হাজার চেষ্টা করেও কিছু জোটাতে পারিনি। হালে বাধ্য হয়ে এমপ্লয়মেণ্টে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ লিখিয়ে তবে এই 'কল'-টা পেয়েছি। আপনার কি মনে হয়, চাকরীটা আদৌ

হবার কোন চান্স আছে? কতজন নিচ্ছে জানেন কিছু? সুলতা বুঝল ওর অনুমান মোটামুটি ঠিক। কিন্তু গোবিন্দর প্রশ্নের উত্তর ঠিক জানা ছিল না। জানা থাকলেও হয়তো সে বলত না। তাই চুপ করেই থাকল।

কিছুক্ষণ পরে প্রায় নিঃশব্দে ফিফ্‌থ্‌ ফ্লোরে রায় সাহেবের ঘরের সামনে গোবিন্দকে পৌঁছে দিয়ে সুলতা বলল, আমি পরে খোঁজ নিয়ে জানাবো। এখন ইণ্টারভিউ দিন তো। ব্যাপারটা এখানেই মিটে যেতে পারতো। সেটাই হয়তো স্বাভাবিক হোত। কিন্তু তা হয়নি। না, গোবিন্দ এখানে চাকরী পায়নি। কিন্তু সেদিন মাত্র কয়েক মিনিটের সাক্ষাতে সে সুলতাকে নতুন করে আবার একটা ভিন্নতর জালে জড়িয়ে ফেলল।

পঁচিশ বছরের বাস্তব বোধে সুলতা মোটামুটি স্থির একটা সিদ্ধান্তে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, জীবনটাকে নিয়ে আর কোনমতেই ছেলেখেলা নয়। এই পঁচিশ বসন্তের জীবনে সে অনেক কিছুই দেখেছে। প্রেম-ভালোবাসা এসব কথাগুলো আজ ওর কাছে আবেগ উচ্ছ্বাসের রঙীন ফানুস বলে মনে হয়। ফানুসগুলো উড়তে উড়তে হঠাৎই চুপসে যায়—সবশেষ। সুতরাং এসব ব্যাপার তার মনের অনুভূতিতে আজকাল আর আকস্মিক কোন রোমাঞ্চ জাগায় না। অতীতের ফেলে আসা কিছু তিক্ততম স্মৃতির জন্যে কারুর প্রতি ওর রাগ বা অভিমান নেই। না, ওর বাবা কিংবা রথীন-অনন্ত কারুর ওপরই নয়। বাবা জন্ম দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করেছিলেন। পিতৃপরিচয় দেবার অধিকারটুকু পর্যন্ত রেখে যাননি। হ্যাঁ, তিনি আজ পেন্নাই অফিসার। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে অন্যত্র পরম সুখে আছেন। না, সেজন্যে আজ আর সুলতার কোন অভিযোগ অভিমান নেই। কেন না, সুলতা জানে, মাধবীলতায় মঞ্জরী মঞ্জরী ফুল ফোটাবার যে অন্তপ্রেরণা তাই তাকে এক পূর্ণ পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে চলে। তবে পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব বোধহয় ততোখানি অনায়াস সাধ্য নয়। রথীন অনন্ত বিভিন্ন সময়ে একে একে ওর জীবনে এসেছিল। তাদের পরণে ছিল রোমিওর বর্ণালী পোষাক। আচার আচরণ এবং কথায় নিপুণ অভিনয়ের ছাপ। কিছু কৃত্রিমতা। বোধহয় সবটাই পোষাকী ব্যাপার। অন্ততঃ সুলতার তাই মনে হয়েছে। রথীন ওকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেনি। কেননা রথীনের একমাত্র বন্ধন তার মা নাকি ছেলের অসবর্ণ বিয়েতে মত দেন নি। ফলত চিরকাল একগুঁয়ে ছেলে রথীন হঠাৎ তার মা-র বাধ্য সন্তান হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং পেছনের দরজা দিয়ে গৃহ প্রবেশে সুলতার অনীহা প্রকাশ করার দরকার হয়নি শেষ পর্যন্ত। অনন্তর ব্যাপারটা সুলতা আজো ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। ওর পারিবারিক গোলযোগের বাধাটাই অনন্তর কাছে একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল—না কি অন্য কিছু? সেটা তবে কি? মাঝে মাঝে সুলতার মনে হয়েছে রথীন সম্পর্কিত অতীতটা বোধ হয় অনন্ত মানসিক দিক থেকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিল না। যদিচ, অনন্তর মুখে সুলতা প্রায়শঃ শুনেছে, ঈর্ষা করতে সে ঘৃণা বোধ করে।

অনন্তকে একদিন প্রচণ্ড বড়ো মনে হোত সুলতার। রথীনকে হারিয়ে সুলতা যখন বিশ্বাস বস্তুটাকে হারাতে বসেছিল—মানসিক যন্ত্রণা জ্বালায় একটা অশান্তির পরিমণ্ডলে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল ঠিক তখনই অনন্ত এসেছিল। ঠিক যেন ত্রাণকর্তা যীশুর মতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। অথচ সেই অনন্ত কত সহজে পর হয়ে গেল! কেন? সুলতা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সেসব ভালোবাসার স্নাংতা মোড়া রঙীন দিনগুলো অনেককাল হোল সুলতার কাছে কাদামাটি হয়ে গেছে। সেসব পুরাণো দিনের কথা নিয়ে সুলতা আজকাল আর কিছু ভাবতে চায় না। সে ভুল থেকে শিক্ষা নিতে চায়। তাই জীবনটাকে নিয়ে ওর একটা পরিকল্পনা আছে এখন। জ্ঞান হওয়া অব্দি সে শুধু উল্টো দিকেই চাকা ঘুরতে দেখেছে। বাবা-মা'র জীবন কোন কালেই সুলতার কাছে বাণী হয়ে ওঠেনি তবু এই নিরাশ্রয়-নিরাদর্শ ছিন্নবস্ত্র সমাজের মধ্যে এসেও কিছুটা চোখ ফেরাতে চেয়েছিল সুলতা। এ যেন সংবাদ—রথীন অনেককাল হ'ল বিবাহিত এবং হালে অনন্তও। সেসব সংবাদে সুলতার আজ আর কিছুই এসে যায় না। এখন চোখ বুজলেই তার চোখের সামনে মূল্যচ্যুত এবং অবিশ্বাসের একটা জগৎ ভেসে ওঠে। তার বেশী কিছু নয়।

বেশ কাটছিল সুলতার। এখন অভ্যস্থ পরিকল্পিত জীবনযাত্রার বাইরে আর কিছু ভাবতেই পারে না। ঘর বাঁধার স্বপ্ন তাকে আর কখনও চঞ্চল করে না। তার বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক জীবনে গোবিন্দ নামে ছেলেটি ঝড়ের মত এসে হঠাৎ যেন কোন বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইছে—ভেবে সুলতা আশংকিত হয়। নিরিবিলি একান্তে বসে প্রায়শঃই ভাবে, কতইবা বয়েস হবে ওর? বড় জোর তেইশ-চব্বিশ। সুলতা নিশ্চিত জানে, গোবিন্দ ওর চাইতে বয়েসে ছোট। শুধু বয়েসেই বা কেন? সব দিক থেকেই দু'জনে বিস্তর ফারাক।

তবু মন জীবন যৌবন বোধহয় বেঁধে রাখার জিনিস নয়—সুলতা বোঝে। বোঝে বলেই তার এত ভয়। অথচ গোবিন্দ কেন কিছু বুঝতে চায় না? না কি বুঝেও না বোঝার ভান করে? সুলতা জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ছেলেদের বোধহয় এই একটা বয়স। যখন তারা কোন বাধা নিষেধই মানতে চায় না।

গোবিন্দ সেদিন ইণ্টারভিউ সেরেই সুলতার কাছে এসেছিল। ছেলেটির স্পোর্টসম্যান স্পিরিট আছে বলতে হয়। বি-কম পাশ করে পিয়নের চাকরী নিতেও কম উৎসাহী নয়।

—ইণ্টারভিউ তো হোল। একটু খোঁজ নিয়ে জানাবেন? আপনি কোথায় থাকেন? সুলতা অফিসে এই ঝামেলা এড়াতে চেয়ে ভুল করে বাড়ীর ঠিকানাটাই দিয়েছিল। গোবিন্দ কাগজটা এক নজর দেখে নিয়েই বলে উঠলো —আরে, আপনিও বেহালায় থাকেন? তবে তো ভালোই হোল। বাড়ীর কাছেই আছেন যখন, মাঝে মাঝে বিরক্ত করবো কিন্তু। সুলতা নতুন করে কথা বাড়াতে চায়নি। আলতো হেসে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। তারপর ফাইলে মন দেবার ভান করেছে। এবং গোবিন্দও একসময় উঠে যেতে বাধ্য হয়েছে।

না, গোবিন্দর চাকরীটা আদৌ এখানে হয়নি। পাশকরা পিওন আর ওরা নিতে চায় না। চাকরীতে ঢুকেই ওরা নাকি আবার কেরানী বাবু হবার স্বপ্ন দেখতে সুরু করে। এই স্বপ্ন দেখার মধ্যে অপরাধটা কোথায় সুলতা তা বুঝে উঠ্‌তে পারে না। এতকাল অবশ্য এসব নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা ছিল ছিল না। এখন সে ভাবে। কেননা, গোবিন্দর চাকরীটা হোক তা সে একান্ত ভাবেই কামনা করেছিল। এই প্রথম কর্তৃপক্ষের এরকম সিদ্ধান্ত সুলতার কাছে অন্যায় বলে মনে হ'ল।

চাকরী না হলেও প্রতিবেশিনীকে গোবিন্দ ছাড়েনি। ওকে এড়াতে চেয়েও সুলতার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে কেন সে তা পারছে না? বয়সে ছোট একটি উজ্জ্বল তরুণ ব্যর্থতায় কিছুটা হতাশ বটে—কিন্তু মন্দ বুদ্ধি নয়। ওর গভীর প্রত্যয় আছে, আন্তরিক নিষ্ঠা আছে। শিশুর মতো ওর সারল্য স্থির একাগ্রতা এবং বাঁচার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম সুলতার ভালোলাগে। কিন্তু ভালোলাগা নিশ্চয়ই ভালোবাসা নয়। গোবিন্দ ভুল করবে না তো? সুলতা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে

লক্ষ্য করছে, গোবিন্দ আজকাল সন্ধ্যের দিকে প্রায়শই ওদের বাড়ী আসছে। ও বাড়ী না আসা অব্দি অপেক্ষা করে—মা'র সঙ্গে গল্প করে। বোধকরি; মা'রও ওকে বেশ পছন্দ। সুলতার সঙ্গে গোবিন্দর গল্পের বিষয় বস্তু অবশ্যই চাকরী-বাকরী সংক্রান্ত। তবু কথা প্রসঙ্গে সুলতা একদিন জেনেছে, গোবিন্দদের সংসারে দাদা বৌদি এবং একটি ছোট ভাই-পো ছাড়া আর কেউ নেই। বদিচ সে সকাল-বিকেল ট্যুইশনি করে, কিন্তু তবু সেটাকে বাড়ীর কেউ আমল দিতে চায় না। বৌদি ওর এই বসে বসে খাওয়া পছন্দ করে না। প্রায়শঃ আজকাল সোচ্চারে সে কথা বলেও থাকে। ওর মনে হয়, দাদাও বোধকরি আজকাল এমনি ভাবছে। তবে এখনও প্রকাশ্যে মুখে কিছু বলে না। ওকে শুধু কাজের জন্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হোতে বলে। অথচ এমনটি না কি আগে ছিল না। এমন দিন গেছে যখন সে ছিল তার দাদার নয়নের মণি। মৃত বাবা-মা'র চেহারাটা গোবিন্দ ভাল করে মনেই করতে পারে না। কিন্তু দাদা তাদের অভাব গোবিন্দকে কোনদিন বুঝতে দেন নি।

কী করে যে সব কিছু এতো তাড়াতাড়ি পাল্টে যায়—গোবিন্দ বুঝে উঠতে পারে না। আজকাল ওর কিছুতেই কিছু আর ভালো লাগে না।

সুলতা এতোদিন জানতো ওর সমস্যাটাই বুঝি সব চাইতে বড়ো। গোবিন্দর কাছাকাছি এসে আজকাল মনে হয়, ওর ধারণাটাই বোধকরি শেষ কথা নয়। এসব ভাবতে ভাবতে সে বুঝতে পারে কখন কবে নিজের অজান্তে তার মনের শান্ত ছায়ায় গোবিন্দর জন্যে একটুকু আশ্রয় রচনা হয়ে গেছে। ওকে বোধহয় কিছুতেই আর ফিরিয়ে দিয়ে নিরাশ্রয় করা সম্ভব নয়। সেদিন বাড়ী ফিরেই সুলতা দেখল, গোবিন্দ মা'র সঙ্গে বসে গল্প করছে। সুলতার কেন জানি না ওকে দেখে নতুন স্বাদের ভালো লাগলো। অফিস ফেরতা পথে এমন একটা গোপন প্রত্যাশাই বোধহয় ওর সারাক্ষণ মনে গাথা ছিল। কাল পরশু ছুটি। ভেবেছিল, যদি আজ গোবিন্দ আসে এবং ওর সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসা যায় তাহলে কেমন হয়!

—গোবিন্দ, আজ একটু মারকেটিং-এ বেরুবো। যাবে আমার সঙ্গে?

গোবিন্দ আপত্তি করলো না। সুলতা প্রস্তুত হ'লে দু'জনে একসঙ্গে পথে বেরুল।

সুলতা মারকেটিং শেষে রেস্তোর'াতে বসে গোবিন্দকে মোগলাই-কষামাংস খাইয়ে দিল। গোবিন্দ কথায় কথায় জানাল—কেরানীর পোষ্টে ইন্টারভিউ-এ লোক

নিচ্ছে। সে দরখাস্ত করেছে। সুলতা ইন্স্যুরেন্সের নামটা শুনেই লাফিয়ে উঠলো। তাই নাকি? আমার অফিসের বন্ধু মীরার মামা ওখানকার এরিয়া ম্যানেজার। মীরা-কে আমি বলে রাখবো'খন।

—রাখ তোমার বন্ধুর মামা। নিজের মামা হলেই হচ্ছে না তো···গোবিন্দর মুখে পরিবর্তিত সম্বোধন শুনে সুলতা পরম উৎসাহ বোধ করলেও শেষের কথাটায় চুপসানো বেলুনের মত ম্লান হয়ে গেল। সুলতা নতুন করে কথা বাড়লো না। ফলত আড্ডাটা তেমন জমল না। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা দু'জন খানিকক্ষণ নির্বাক এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করল। এবং পরে এক সময় যে যার বাড়ী ফিরল।

গোবিন্দ আজকাল প্রায় রোজই আসছে। ক্রমশঃ ওরা যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন সেই আগেকার মতন! সুলতা আশংকিত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। অথচ কিছুতেই নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না। সুলতা জানে, নিজেকে সংযত ও শাসন করতে না পারায় সে একদিন অনেক দুঃখ সয়েছে। এখন তার জীবনের একটা পরিকল্পনা আছে। প্রতিটি পদক্ষেপ সুচিন্তিত। সেখানে কোনমতেই গোবিন্দর কোন স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

সেদিন গোবিন্দ ওর অফিসে এসে হাজির হোল। বলল, সুলতা, আজ ট্যুইশনির টাকা পেলাম। চলো, একটা সিনেমা দেখবো। ইভিনিং শো'র। টিকিট নিয়েই এসেছি। তোমার কোন আপত্তি শুনবো না কিন্তু।

সুলতা আরো একবার নিজেকে ভাগ্যের হাতেই সঁপে দিল। হিন্দী ছবি ও কিছু বোঝে না। কিছু জরুরী কাজও ছিল বাড়ীতে। তবু কেন জানি না আপত্তি জানাবার সামান্য শক্তিটুকুও খুঁজে পেল না। অফিসে এখন ইয়ার-এণ্ডিং-এর কাজ চলছে। সারাদিন ফাইলের মধ্যে ডুবে থেকে সুলতা হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাই শুধু বলল—আগে কোথাও বসে আমাকে কিছু ফ্রেস এয়ার নিতে হবে। তারপর—সিনেমায় যাওয়া যাবে।

সেইমত ওরা কার্জন পার্কের নির্জন নিরিবিলিতে বসেছিল। এক সময় গোবিন্দ বলল—সুলতা, আজ কদিন ধরেই তোমাকে একটা কথা বলবো বলবো ভাবছিলাম।

—কি কথা? সুলতা চমকে উঠলো। কি কথা বলতে চায় গোবিন্দ? হঠাৎ সুলতার বড় বেশী রকম ভয় করতে লাগলো। একলা এ ভাবে গোবিন্দর সঙ্গে বসে সুলতা আকাশের দিকে তাকাল। সূর্য ডোবা পশ্চিমাকাশে সিঁদুরে

মেঘ দেখতে পেল। একটা অজানা আশংকায় গোবিন্দর উত্তর প্রত্যাশা করতে থাকল। গোবিন্দ অনেকক্ষণ কিছু কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেললো। দু'জনে অনেকক্ষণ নির্বাক বসে থাকলো। দারুণ শীতল স্তব্ধতার মধ্যে কব্জি ঘড়ির চলমান যন্ত্রের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। গোবিন্দ ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে সময় দেখল। ইভিনিং শো সুরু হতে আর বেশী দেরী নেই। তাই যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে গুমোট নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠলো —সুলতা কিছু বলছো না তো।

—আমি তো শুনবো। তুমি কী বলবে বলছিলে যেন?

—না, না। তেমন কিছু নয়। বলছিলম, তুমি যে সেদিন তোমার কোন বন্ধুর মামা'র কথা বলছিলে। তাকে একটু বলবে আমার হয়ে?

মুহূর্তে সুলতার মুখের রঙটা কেমন পাল্টে গেল। চোখ দু'টো নিষ্প্রভ ম্লান হোল। বুক উজাড় করা একরাশ বিষণ্ণতা এবং নৈরাশ্যে ডুবে যেতে থাকল। সে রথীন অনন্ত এবং গোবিন্দ—তিন তিনটি মুখ এক সঙ্গে দেখতে পেল। দু'টো ভাগ করলো—একদিকে রথীন অনন্ত। অপর দিকে গোবিন্দ একা। মনে মনে ভাবল, গোবিন্দ কোন মতেই তার কাছে রথীন কিংবা অনন্ত নয়। তার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ক্রমশঃ ক্লান্ত ও শীতল হোতে থাকল। বুকের ভিতরকার সমস্ত ভয় ভ্রান্তি এবং আশংকা একে একে মিলিয়ে যেতে থাকল। আর সেই সঙ্গে মনের ভিতরকার একান্ত নিজস্ব ঘর থেকে গোবিন্দ দূর হতে দূরান্তে চলে যাচ্ছে। শূন্য ঘরের উন্মুক্ত কপাট অশান্ত দোল খেতে খেতে কেবলি আঘাত করতে থাকে।

KRISHANU Quarterly Vol. VI/No. I Regd. No. R.N. 165

TRANSPORT DEVELOPMENT CORPORATION

132, Lenin Sarani, Cal-13
PHONE : 24-5947/4556.

Road Transporters, Clearing & Forwarding Agents, Warehousing Contractors, Freight Forwarders for South Eastern Railway & Eastern Railway.

ROCKET SERVICE TO :
MADRAS, DELHI & HYDERABAD.

Branches : DHANBAD, PATNA, BARAUNI, MUZAFFARPUR, BIHAR-SHARIFF and MADRAS, BOMBAY, HYDERABAD, DELHI.

শ্রীমলিন দত্ত কর্তৃক জগদ্ধাত্রী প্রিন্টার্স ৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন.